তোর্সা নদী স্কিজোফ্রেনিক

গার্গী ভট্টাচার্য

Torsha Nodi Schizophrenic

Gargi Bhattacharya

Copyrighted material

তোর্সা নদীকে----!!!

বই এর গ্রীণরুমে

তোর্সার হ্যালুসিনেশান্ হয় । সে স্কিজোফ্রেনিক- কারণ তার যা মনে হয় তা সত্যি নয় অথচ সেগুলি লিপিবদ্ধ করলে, এক একটি মনোরম কাহিনী হয়ে দাঁড়ায় তাই ওকে একটি অপরূপ নদী বলি ।

ছায়ানটী তোর্সার প্রতিটি জলবিন্দু , মহাকালের বুকে ঝরে পড়ছে । তোর্সার ঢেউ- লেখকের মনের আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে ।

ওর বুকে গল্পের ছবি আঁকা হলেও, আয়নার মতন তোর্সা নিজেকে কোনোদিন দেখেনি । নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওর কোনো ধারণাই নেই । তাই লেখক লিখছে।

তোর্সা নদীর কথামালা, মধুক্ষরা হলেও রিয়েল ওয়ার্ল্ডে তা কেবলই স্কিজোফ্রেনিক--কারো মন ।

একদিকে তোর্সার বাস্তব জীবন- মানে তার স্রোত ও ঢেউ আর অন্যদিকে তার স্কিজোফ্রেনিয়া । এই Yin Yang নিয়েই জীবন্ত নদীটি ; যার বসবাস একই সাথে, পার্থিব জগতের অন্দরে ও বাইরে ।

খনন

প্রযুক্তিবিদ্ সন্দীপ পাইন খুবই টেকনোলজি পছন্দ করে । বাজারে নতুন কিছু এলেই সে কিনে ফেলে ।

সম্প্রতি থ্রি ডি প্রিন্টার কিনে ফেলেছে ।

লোকটি খুব ধান্দাবাজ ও চালিয়াৎ । নিজের বৌ উঠ্তি মডেল । নামের বাহার আছে তার । তিস্তাতোর্সা পাইন । মেয়েটি ঐশ্বর্য রাই হতে চায় কিন্তু সেরকম রূপ বা চটক নেই তার । তার স্বামী থ্রি ডি প্রিন্টারে তার সমস্ত অ্যাসেট মানে সেক্স অর্গ্যান ছাপিয়ে বাজারে বিক্রি শুরু করেছে । প্রাচ্যের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি তার একেবারেই না পসন্দ । মনে হয় খুব ওল্ড সবকিছু ।

এলাকায় একটি বেদ পড়ার পাঠশালা আছে । সেখানে গিয়ে পুরোহিতদের প্রায়ই ব্যঙ্গ করে সন্দীপ ।

--এসব ওল্ড জিনিস বাতিলের তালিকায় । দেখছেন না লোকে আজকাল জুপিটারে চলেছে । আর আপনারা কচি কচি শিশুদের এইভাবে ধরে এনে, বেদ ফেদ পড়িয়ে ব্রেন ওয়াশ করছেন কেন ? বেদের যুগে কেউ চাঁদে গিয়েছিলো ?

পুরোহিত মশাই, নাম সংকেত গোস্বামী একজন **আই আই এম থেকে পাশ করা ম্যানেজমেন্টের মানুষ ।** এখন ফুলটাইম বৈদিক পাঠশালায় পড়ান ।

উনি হেসে বলেন , আপনি দেহের অঙ্গ ছাপিয়ে বাজারে বিকাচ্ছেন, তাও আপনার স্ত্রীর । একে আপনি প্রগতি বলেন ? আর কেন এগুলো করছেন জানেন ? কারণ আপনার নশ্বর দেহের সাথে আপনার গভীর বন্ধুত্ব আছে । এই যেমন এক যন্ত্র বেরিয়েছে যা দিয়ে কিডনির কাজ করানো যাবে , কিডনি ফেল করলে লোকে আর বিপদে পড়বে না- এটা ভালো জিনিস কিন্তু আপনি যা করছেন তা কি খুব উচ্চমানের ? বেদ কিন্তু বলে দেহের বাইরে চলে যেতে । কে এগুলো করছে তা খুঁজে বার করতে । দেখবেন- করছে আপনার মন ।

সেখান থেকেই চাঁদ, সূর্য প্রজেক্ট হচ্ছে । ভিনাস, জুপিটার-এই সবকিছুই আমাদের মনের প্রতিফলন । বেদে বলা হয় ; শুদ্ধ চেতনার এক অংশ হল আমাদের মন -আরো গভীরে গেলে দেখা যাবে

মনের নিচেও একটা জিনিস আছে । সেই অংশটুকুই অমর ও সত্য । সেখানে আছে শুধুই আনন্দ আর শান্তি । চাঁদের ফাঁদ নেই সেখানে । গ্রহ, নক্ষত্র তো সব দেখা যায় । কিন্তু কে দেখছে ? সেই অনুসন্ধান এর কথাই এইসব গ্রন্থে বলা আছে । যে দেখছে সে শুদ্ধ চেতনা । দেহ নয় । তাই সেখানে দেহ আর তার নানান টেম্পটেশান নেই । এক এক বিন্দু হরমোন, আপনাদের শুদ্ধ চেতনাকে পুরো হ্যাক করে দিয়েছে যার জন্য আপনি এরকম ঘৃণ্য এক কাজে নিজেকে জড়িয়েছেন । কিন্তু কে জড়াচ্ছে ? কে দেখছে ? সে হল মন । আর দুষ্টমনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার রাস্তাই দেখানো আছে বেদ-বেদান্তে । যতই আপনার প্রযুক্তি এগিয়ে যাক্ আর নতুন জিনিস বার হোক্ না কেন ,সত্যের ওয়াইড একটা সাব্-স্ট্রাটাম্ আছে (substratum), **যার ওপরেই সব ভাসছে , তাই খনন দরকার । বেদ সেই খনিতে নিয়ে যায় ।**

এরপরে সন্দীপ ওর ঐ বিশেষ যন্ত্রটা বেচে দিয়েছে । আর স্ত্রী, মডেল থেকে মানুষ হয়েছে । সে এখন গঠণমূলক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছে । নিজেকে পণ্য না করে ।

বাউন্সার

শহরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় পথচারী সারমেয় যার নাম লোকে রেখেছে বাউন্সার । নামের কারণটা আজব । এতদিন ওকে কেউ গ্রাহ্য করতো না । নামও কেউ দেয়নি । ময়লার ডিব্বা থেকে এলোপাথারি খাবার খাওয়া এই অদ্ভুত ভালো কুকুর একদিন এক অন্ধ মহিলাকে এক্সপ্রেস বাসের ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে দেয় । আসলে অন্ধ ভদ্রমহিলা একা রাস্তা পার হতে গিয়ে বাসের কবলে পড়তে যাচ্ছিলেন । দ্রুত গতিতে চলা এই বাসটি কাছে এসে পড়লে কুকুরটি লাফিয়ে পড়ে মহিলাকে বাঁচিয়ে দেয় । মহিলা হঠাৎ ধাক্কা লেগে ফুটপাথে চিৎ হয়ে পড়ে যান । কুকুরটি কিন্তু ওনার পোষা কিছু নয় । রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো এক নেহাৎই অনাদৃত পশু ।

ওর এই বীরত্ব আর সহানুভূতি দেখে লোকে ওর নাম দেয় বাউন্সার । যেন ধনীদের বডিগার্ড, কোনো বাউন্সার- পথে নেমে পাহারা দিচ্ছে রাতদিন ; আরো অনেক দৃষ্টিহীন মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচাতে ।

<u>নোট -একটি হেল্প ডগ এমন করেছিলো আর এক পথের কুকুর একদা , এক ছিনতাইকারীকে ধরে ফেলে ।</u>

<u>হাঁদা</u>

<u>হাঁদা</u> বলে পরিচিত পেদ্রো ; আদতে অর্ধ-মানব ।

ওর ইন্টেলেক্‌চুয়াল ডিসেবিলিটি আছে । ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে । কথা বলার সময় জড়িয়ে যায় ।

এমনই এক মানুষ কিন্তু চাকরি করে এক হাই টেন্‌শান ফিল্ডে । রাগবি খেলার এক ক্লাবে সে নিয়মিত যায় । ওর কাজ হল প্লেয়ারদের শান্তি দেওয়া ।

প্রচন্ড টেন্‌শান পূর্ণ এই খেলায়, যখন লোকে হেরে যায় তখন তারা মুষড়ে পড়ে আর ঠিক সেইসময় নাকি তাদের মনে হয় যে জীবনটাই বৃথা । পেদ্রো এখানেই শুরু করে । ওকে দেখে লোকে মনে করে যে এই মানুষটা এত সাদাসিধে, আর সবকিছু বোঝেও না ।

তবুও সে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে । জীবনকে উপভোগ করছে । কোনো অনুযোগ নেই ওর- কারো বিরুদ্ধে । আর আমরা তো একদম সুস্থ সবল লোক । শুধুমাত্র একটা খেলায় হেরে গেছি বলে এত ভেঙে পড়ার কী আছে ? **আরে বাবা, এন্ড অফ্ দা ডে এটা তো খেলাই ! যুদ্ধ তো নয় , তাই না ?**

শুধুমাত্র জীবনের হাত ধরে, সবকিছু সহ্য করেও যে হাসিমুখে বেঁচে থাকা যায় তাই দেখাচ্ছে সরল মানুষ পেদ্রো , সেটাই তার কৃতিত্ব আর তারজন্যই সে নিয়মিত মাইনের বন্ধনে নিজেকে বেঁধেছে ।

ও কিন্তু একজন নিয়মিত কর্মী, যে মাস মাইনে পায় । কোনো ডিসেবিলিটি পেনশান নেয়না ওর জীবন শৃঙ্খলের জন্য । কোনোদিনই নেয়নি ।

(পরবাসে, একটি বিখ্যাত খেলার দলে এমন একজন মানুষ সত্যি আছেন । তাকে সবাই রীতিমতন সম্মান দেয় ।)

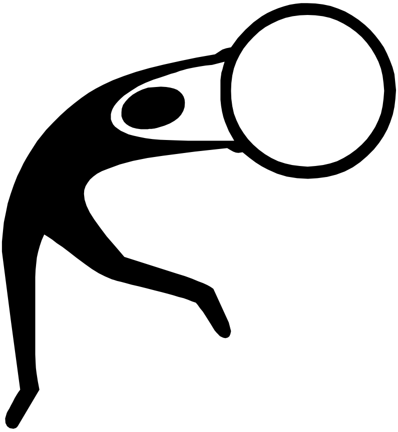

খেলাঘর

হকির বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে । ভারত আজও হকি ভালই খেলে । যথেষ্ট নাম আছে । বিশ্বকাপ হকিতে, পরপর দুবার জিতে ফাইনালে উঠেছে ভারত ও কাপ পেয়েছে । এইবার জিতলে একেবার তিনবার, একটানা জয় হয়ে যাবে । কম ইংরেজি জানা লোকেরা টুইট করেছে-- **হ্যাট্রে-টিক্ হয়ে যাবে ।**

সবাই খুব আনন্দে আছে । মজায় আছে । ভারত জিতেই যাবে । কারণ উল্টোদিকে ছোট্ট দেশ কুচিনভো। এই ক্ষুদ্র দেশ, সবে হকি খেলায় নেমেছে । সব মিলিয়ে মাত্র ১ লক্ষ লোক থাকে ওদের দেশে । তার মধ্যে হকি খেলে আরো কম লোক । দরিদ্র এই দেশে, খেলোয়াড় হতে গেলে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয় । তাই ওরা উত্তেজিত এইভেবে যে হেভি-ওয়েট ভারতের বিরুদ্ধে ওরা হয়ত জিতবে না কিন্তু ফাইনালে তো গেছে !পরবাসে ওদের দেশের কিছু মানুষ আছে । তারা

ভোর থেকে অথবা রাত জেগে, পরদিন অফিস কামাই করে টিভিতে খেলা দেখবে । সারা দুনিয়ার মানুষ এই দেশের সাথে পরিচিত হতে পেরেছে হকি ফাইনালের কারণে । কম কথা ?

*****

অসাধারণ মানুষ ভারতের অধিনায়ক বিধুবল্লভ ঠাকুরিয়া । অভিজাত ও সত্যিকারের খেলোয়াড় । রিয়েল স্পোর্টস্ ম্যান ।

এই ক্ষুদ্র দেশকে সম্মান দিতে ও তাদের পরিশ্রম, একাগ্রতা ও সততাকে উৎসাহ দেবার জন্য ভারতের অধিনায়ক না খেলেই, কেবলমাত্র স্পোর্টস্ম্যান হিসেবে একটি জেস্চার দেখান । ওদেরকেই জিতিয়ে দেন ঠাকুরিয়া-- শুধুমাত্র এই ছোট্ট দেশের নিষ্ঠার কথা মনে রেখে । **Sports betting**, বুকি ও হাড্ডাহাড্ডির লড়াই এর আধুনিক জগতে এই ঘটনা যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ।

অবাক হয় দুনিয়া কিন্তু ভারতীয়রা নয় । কারণ স্লাম ডগ বললেও -আমাদের রক্তে ও হৃদয়ে লেখা আছে সহনশীলতা ও আতিথ্যের ইতিহাস ; গোটা গোটা উজ্জ্বল অক্ষরে-- শতাব্দী ধরেই ।

স্কিজোফ্রেনিক

নন্দনা পালের একটি আজব অসুখ আছে । তিন বোন ওরা । বন্দনা, চন্দনা আর নন্দনা । সবচেয়ে ব্রিলিয়্যান্ট ছিলো এই নন্দনাই । কিন্তু যৌবনকালেই ওকে ধরে ফেলে, এক কঠিন ব্যাধি । লোকে বলে স্কিজোফ্রেনিয়া । ওর হ্যালুসিনেশান হয় । কথা শুনতে পায়, লোক দেখতে পায় যা আর কেউ পায়না , দেশের প্রেসিডেন্ট ওকে ফোন করেন ইত্যাদি । চিকিৎসক ওষুধ দিয়েও কন্ট্রোল করতে সক্ষম হয়না । সাইকোলজিস্ট ওকে শিখিয়ে দেয়- ওষুধ না খেয়ে, মাইন্ডফুলনেস্ প্র্যাকটিস্ করতে । তবুও ওর কোনো উন্নতি হয়না । আজব এক আনরিয়েল জগতে ওর বাস । জীবনটা যে এতটা ডিস্‌টর্টেড্ তা ওর সংস্পর্শে না গেলে জানা যায়না ।

অথচ ওর মা দ্যাখে যে ওর দেখা অনেক কিছুই পরে ফলে যায় । যেমন একবার ও এক ব্যাক্তিকে, নিজের অসুখের অ্যাটাকের সময় একটি হোটেলে দেখেছিলো । পরে জানা যায় যে সে তখন ওখানেই ছিলো । ওর বাবাকে লোকে বিষ প্রয়োগ করছে এটাও ও দেখেছে । পরে ওর বাবার দেহে সত্যি সত্যি বিষ প্রয়োগ করা হয় । করে তার কলিগেরা ।

নন্দনা, এমনও বলতো যে ওর পরিবারের একজন মানে চন্দনাকে বধূ হত্যার ফাঁদে ফেলা হবে । হলও তাই । তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হল । আবার অনেক কিছুই বলে যা মেলেও না ।

ওকে সবাই স্কিজোফ্রেনিক বলে । কিন্তু ওর মায়ের মনে হয় যে ও কোনো মানসিক ব্যাধির শিকার নয় । হয়ত কোনো শক্তি ওকে ভড় করে- কখনো কখনো যার কথা আজও আমরা জানিনা । আবার কখনো ও সত্যিই এক মায়াজালের ফাঁদে পড়ে ; স্কিজোফ্রেনিক !

নোট: লেখিকা এক ব্যাক্তিকে চেনেন যার স্কিজোফ্রেনিয়া কখনো কখনো রিয়েলিটি হয়ে যায় ।

XXXXXXX

ইয়াফ্‌তা

মোহিনী-মোহন নাচে নাম কিনেছিলো ইয়াফ্‌তা দিলরুবা । দ্রাবিড় সুন্দরী ইয়াফ্‌তা, খুব কম বয়সে নিজের নৃত্যকলার মাধ্যমে, দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছিলো ।

আর কেবল নাচ নয়- মেয়েটির স্বভাবও খুব মধুর ।

এহেন এক মানবীর জীবনে, অকস্মাৎ নেমে এলো মেঘ কালো । মেঘ ওড়নায় ঘায়েল হল -সরল নর্তকীর জীবন । মেঘ, এখন শুধুই চোখের বৃষ্টি ! বেকায়দায় পড়ে গিয়ে মেরুদন্ডের এক আঘাত, প্রাণঘাতী নাহলেও **তা না না দ্রিম দ্রিম**- কেড়ে নিলো মেয়েটির শুদ্ধ জীবন থেকে ।

--ভালো মানুষের সাথেই সবসময় খারাপ জিনিস কেন হয় ? প্রশ্ন করে ওর এক ভক্ত ।

প্রায় দশ বছর ধরে বিছানায় শুয়ে থাকা মেয়েটি ভাবে তার আর কোনো আশাই নেই । যতদিন বাঁচবে এইভাবেই হয়ত কেটে যাবে তার দিন । শুকিয়ে কাঠি হয়ে , বেড সোর হয়ে, পচে গলে যাবে শৃঙ্গার করা চেতনা । তাই সবসময় ওর পরিবারের মানুষকে বলতো ওকে দূর্লভ সমস্ত গহনা দিয়ে সাজিয়ে রাখতে । কিছুটা ভালোলাগতো । নাচের গয়না পরে কিছুটা শান্তি পেতো এই ছন্দশ্রী ।

অনেক বছর পরে এক যোগ শিক্ষকের কথা জানতে পারে ; এক ওয়েবসাইট থেকে । হিমালয়ের গহীন বনে এর বসবাস । আশির ওপরে বয়স যোগীরাজ লালকিশোর চামিন্ডার । ওঁর ওয়েবপাতার সংস্পর্শে এসেই ইয়াফ্তা জানতে পারে, এই অসম্ভবকে সম্ভবে রূপান্তরিত করার পন্থা ।

বাবাজীর সাথে যোগাযোগ হয় যোগের জন্য । যোগ হয় এক অসহায় নারীর সাথে, এক বয়সের ভারে ন্যুব্জ নয়

সবল পুরুষের । সাড়ে ৬ ফিট উচ্চতার , গৌরবর্ণ এই যোগ শিক্ষক, ধীরে ধীরে সারিয়ে তোলেন মেয়েটিকে ।

ইয়াফ্তা এখন- দরিদ্র, পঙ্গু মানুষকে ফ্রিতে যোগ শেখায় । বলে , ধনীদের জন্য অনেক স্পা ও যোগ শিক্ষক আছেন-- আমি এদেরকে দেখি !

এখন মেয়েটি আবার আগের মতন নাচতেও পারে ।

(আংশিক সত্য ঘটনা)

পাহাড়ের গায়ে

সিকিমের ছেলে ঝিনি আর তার বৌ সন্ঝা থাকে পাহাড়ের গায়ে । ঝিনি চালায় রেলগাড়ি । ইঞ্জিন ড্রাইভার । আর সন্ঝা চালায় এক হোটেল , পাহাড়ের গায়ে ।হোটেলের মালিক আদতে পাহাড়ের লোক নয় । বড়ুয়া সাহেব এসেছে নগর থেকে । **অহিল বড়ুয়া** এই হোটেল খুলেছে বটে কিন্তু ছয়মাসে একবার এখানে আসে ।

মূল কর্মকান্ড চালায় ঝিনির বৌ, সন্ঝা ।

সিজনে হোটেল ভালো চলে । সন্ঝা, গেস্টের দেখভাল করার সাথে সাথে, ব্যাক্তিগত সুখ সুবিধেও দেখে । অনেক সময় উপহার দেয়- হোটেল ছাড়ার সময় । সকালে ঘরে তাজা ফুলের মালা , বিছানায় মখমল চাদর , খাবারের টেবিলে লোভনীয় খানা তাও অল্প দামে ; অনেক ভ্রামণিকের মন ভোলায় । তারা বারবার আসে এই পাহাড়তলিতে ।

এই পান্থশালাকে আষ্টেপিষ্টে ধরেছে, পর্বতমালা । আর হোটেল রংপিং- এর আত্মাকে ; সন্ঝা । ভালই কামায় সে । অনেক উপরি পায় । ওর বর ঝিনিও মন্দ কামায় না । বিকেলের আগে সে রেলগাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসে কারশেডে । তারপর বাকি সময়টা কাটায় গরম চা ও মোমো নিয়ে, পথের ধারে এক গুমটিতে । সেখানে তার নিত্য সঙ্গী এক দামী ব্যাক্তি ।

এই মানুষটি, এক ছায়াজগতের বাসিন্দা ছিলো । প্রতিটি সেকেন্ড যার একটা সময়, কোটি টাকায় বিক্রি হতো । **পোশাকি নাম অ্যাড ম্যান ।**

চমৎকার বিজ্ঞাপণ বানানো ও কর্পোরেট হাউজের বিক্রি বাড়িয়ে দেওয়া এই মানুষের, সময়ের দাম তো হবেই !

আক্ষরিক অর্থেই তা ছিলো দামী ।

কিন্তু আজ আর নয় । আজ এই গুমটিতে বসে সময় কাটায় এই মানুষ । ছায়া মানুষ ।

কারণ তার আর জীবনের প্রতি কোনো মোহ নেই ।

সমাজের শিখরে উঠে দেখেছে, সবই আছে কিন্তু কোথাও শান্তি নেই । তাই আজ সিকিমের এই ক্ষুদ্র

জনপদে, সারাটা দিন বসে বসেই সময় কাটায় । আর ঝিনির অফুরন্ত বকবকানি শোনে ।

সারাটা দিনের যাত্রীর ইতিহাস , সিকিমের অজানা ভূগোল আর মানুষের অলিখিত সাইকোলজি ।

গাঢ় সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার পথে, যায় ঝিনির বৌয়ের হাতের গরমাগরম চা খেতে- তার হোটেলে ।

আবার পরের দিন একই রুটিন ।

তবুও বোর হয়না ক্রিয়েটিভ অ্যাড ম্যান ।

কারণ এখন সে শান্তি প্রচারের জন্য অ্যাডের শুটিং করছে । এই কাহিনীর নায়ক ঝিনি, নায়িকা সন্ঝা আর পরিচালক হল জীবন ।

অ্যাড ম্যান এখানে কেবল দর্শক । রিং এর বাইরে বসে দেখছে, জীবনে সফল না হয়েও শান্তি পাওয়া যায় ।

এমন মানুষের কাছেও আছে সুখ ; যাদেরকে প্রতি সেকেন্ডে এক কানাকড়িও কেউ দেবেনা ।

আর এসব নাটক ক্রমাগত অভিনীত হচ্ছে নীরবে, সিকিমের পাহাড়ের গায়ে ।

লজ্জা

কলকাতার বেশ কিছু দূরে এক জনবহুল এলাকায় ; আজও ডাকাত পড়ে । এইসব অত্যাধুনিক ডাকাত ওখানে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে ।

শেলির মা- **এইরকম এক ডাকাতিয়া রাতে , দস্যু লগ্নে --খেয়েছে ডাকাতের হাতে এক চড় ।** ভদ্রমহিলার অপরাধ হল এই যে উনি ডাকাতকে শনাক্ত করে ফেলেছিলেন ।

নগর বদলে ফেলেছে- শেলির পরিবার আর মা-টিকেও সঙ্গে নেয়নি । বরং তাকে ফেলে গেছে এক বৃদ্ধাশ্রমে ।

এইসব আশ্রমে যাবার বয়সও হয়নি তার । মধ্য পঞ্চাশ মাত্র ! মাত্র নয় বছর বয়সে বিয়ে হয় তার আর এরপরেও ভারতের লোকেরা, সাহেবদের সমাজে পেদোফাইল আছে বলে গালি দেয় ।

শেলির মাকে, বাড়ির পুরুষেরা - লজ্জায় ত্যাগ করেছে । এমন মেয়েমানুষকে কী রাখা চলে যে দস্যুর হাতে চড় খায় ? অপবিত্র হয় ? অসতী হয়ে যায় ?

ডাকাত স্পর্শ করেছে তাকে !

ভদ্রমহিলা ভেঙে পড়েন ।

আগেকার যুগ হলে, সততা ও সাহসের জন্য ভদ্রমহিলা বন্দিত হতেন । আর এখন তার সাহসের প্রশংসা না করে, নিজের গর্ভজাত সন্তানেরাই তাকে ত্যজ করেছে অদেখা এক লজ্জায় । বড় লজ্জা করে ওদের মাকে কাছে রাখতে । পরবর্ত্তী প্রজন্মের বিয়ে হবেনা , লোকে গায়ে থু থু দেবে আরো কত কি !

ডাকাতের চড় বলে কথা?

শেলির মায়ের এক নাতি সরল চোখে চেয়ে, বলে ওঠে :: বাবা, ঠাম্মাকে যদি আশ্রমে গিয়ে ডাকাত খুন করে, ওদেরকে চিনে ফেলার জন্য তাহলেও আমরা তো বেঁচে যাবো তাই না ?

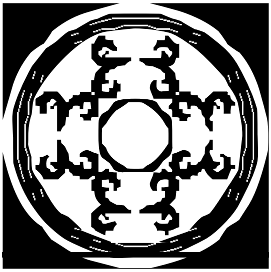

শকুন্তলা

শকুন্তলার পরিচয় আজ আর দেবার কিছু নেই । সফল এক নারী সে । শুধু একজন বিদুষী নয় বরং মাল্টি টাস্কিং করতে পটু এই রমণী ; প্রথম এক নারী যে ফাইনান্স জগতে উঁচু উঁচু সিঁড়ি চড়ে, এক ব্যাঙ্কের প্রথম মহিলা চিফ্ হয়েছে ।

শকুন্তলাকে ছেড়ে থাকতে পারেনা তার স্বামী অতীশ পান্ডা । বৌ-ও স্বামীর জন্য পাগল । কাজের ফাঁকে ফাঁকে টেক্স্ট করা , মিটিং শেষ হলেই ফোন করা এসব করতে ভালই লাগে শকুন্তলার, যাকে আদর করে বর ডাকে শিখি বলে ।

উষ্ণ শহর দেবরাজগড়ে, শীত ক্ষণস্থায়ী ।

দুপুরে, সোনালী রোদ পোহাতে বসতো পিঠে পিঠ লাগিয়ে ওরা দুজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠেঘাটে ।

পেছনে হাল্কা নদীর পরশ । হয়ত তোর্সা হয়ত বা অন্য কিছু । ম্যাক্রোর থেকে মাইক্রো ইকোনমিক্সটা বেশি ভালো লাগতো অতীশের । আর স্ট্যাট্ তো খুব প্রিয় বিষয় ছিলো তার । আই এস আই য়ের ভর্ত্তির পরীক্ষা নাকি আই আই টির থেকেও বেশি কঠিন হয় , কোথায় শুনেছিলো শকুন্তলা । তবে ওর মনে হতো যার যেদিকে প্রতিভা থাকে সে সেটা সহজেই পারে । অন্যের কাছে হয়ত তা কঠিন । যে অংক-এ ভালো সে **আই এস আইতে** সফল হবে সহজেই আবার যে ভালো আঁকতে সক্ষম সেও সহজেই আর্ট কলেজে চান্স পাবে । সহজ/ কঠিনের ব্যাপারটা মিডিওকারদের জন্য কিংবা যাদের ওদিকে কোনো আগ্রহ নেই তাদের জন্য ।তবে অতীশ কিন্তু সেসব প্রশ্নপত্র, অতীব পারদর্শিতার সাথে সমাধান করে ফেলতো । তবুও তার স্বামী অতীশ নেহাৎ-ই এক সরকারি কর্মী -যার পোশাকি নাম মালবাবু ।এক সরকারি গুমটিতে কাজ করে সম্প্রতি অবসর নিয়েছে সে । আধাশহর দেবরাজগড়েই কেটেছে তার জীবন । শকুন্তলা যখন বিদেশে গেছে কাজে

কিংবা হাই-ফাই বন্ধুদের সাথে ঘুরতে ; তখন অতীশ পান্ডা , গন্ডা গন্ডা- মন্ডা মিঠাই খেয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছে মফ:স্বলের ঐতিহাসিক স্তূপ ; মুসারফ্ মঞ্জিলের বাগিচায় ।

--এত হাই প্রোফাইল আপনার স্ত্রী , আজ টোকিও তো কাল প্যারিস করছেন আর আপনি এই মফ:স্বলের বাইরেও যাননি ! কেমন লাগে ? ভয় হয় না ? যদি আপনাকে ফেলে চলে যান ? সহ্য করেন কী করে স্ত্রী সাফল্য, নিজে সফল না হয়েও ?

অতীশ খালি হাসে । কথা বলে না ।

শকুন্তলাকে প্রশ্ন করলে জানা যায় যে সে নাকি অতীশকে ছেড়ে যাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনা । কারণ চিরটাকাল অতীশ ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে আর শকুন্তলা সেকেন্ডও হতোনা । তবুও অতীশ তাকে প্রপোজ করেছে ও পরে বিয়েও হয়েছে । এত ব্রিলিয়্যান্ট একজন পুরুষ, যে ওদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিলো, তাকে স্বামী রূপে পেয়ে দারুণ খুশি শকুন্তলা ।

এতেই আজও মুগ্ধ সে । অতীশ যা কাজ করেছে তাতে সেও খুশি ও সুখী । ভালো আছে সে । কোনো হেরে যাওয়ার ব্যাপার নেই তার হৃদয়ের কোণে । নিজেই বেছে নিয়েছিলো নিশ্চিন্তের এই জীবন ।

বেশি সিরিয়াস কাজ করেনি কিন্তু অবসরে চাঁদের আলোয় বসে বসে **Poisson's ratio** , মাইক্রো ইকোনমিক্সের গ্রাফ ও কার্ভস্ নিয়ে সময় কাটিয়ে মনের তৃপ্তি পেয়েছে । এ যেন অনেকটা **গুগুলের** মতন । অসম্ভব জ্ঞানী কিন্তু তাকে কেউ সম্মান দেয় ?

ছেলেমেয়েদেরও মানুষ করে দিয়েছে ।তাই তো শকুন্তলা আজ হিল্লি তো কাল দিল্লী করতে পারছে । এই ত্যাগকে সে মর্যাদা দেয় । তাকে ফার্স্ট নাহলেও সম্মান দিয়েছে অতীশ, তাই সেও ওকে যথেষ্ট রেস্পেক্ট করে ।

কাজেই নিজে অত্যন্ত উচ্চপদে কাজ করলেও ওদের দুজনের মধ্যে কখনো কোনো ঝামেলা বা কোল্ড ওয়্যার চলে না কারণ **শিখি যে আগেই তার অতীশের কাছে মার্কশিটে হেরে বসে আছে !**

জয়ন্তিয়া

কালো মেয়ে,জয়ন্তিয়ার জীবনটা কেটেছে নগরের মাঠেঘাটে ।

চা বাগানের মেয়ে জয়ন্তিয়া , বাগানের কাজ কমে গেলে নগরে পাড়ি দেয়, কর্মের খোঁজে । বাগানে অনেক ঝামেলা , সমস্যা ইত্যাদি হয়ে হয়ে ওগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো । জয়ন্তিয়া এখন নগরে আয়ার কাজে নিয়োজিত ।

আগে করতো লোকের বাড়িতে বাসন ধোয়ার কাজ । পরে রান্নার কাজ আর এখন আয়া । কালো মেয়েটির বাবা নাকি এক সাহেব ট্যুরিস্ট, যে ওর শ্রমিক মায়ের গর্ভে ওর জন্ম দেয় । লোকটি আসলে পরে বাগানে আসে, ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে । দ্বিতীয়বার ওর মা, আরেক শ্রমিকের সাথে ঘর বাঁধে কিন্তু এবারও বিয়ে হয়না । এখন সেই বাবা যাকে জয়ন্তিয়া বলতো **ব্যাটা ;** সে নেই । মৃত । মায়ের অনেক বয়স হয়েছে । চোখে

দেখেনা। লাঠি নিয়ে হাঁটে, অল্প অল্প করে। দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেমেয়েরা তাকে গ্রাহ্য করেনা। মা রোজ বলতো - সম্পর্ক হল , বাচ্চাও হল কিন্তু বিয়ে হলনা মোটে !

এখন জয়ন্তিয়া কয়েক হাজার ক্রোশ দূরত্ব পেরিয়ে মাকে দেখতে যাচ্ছে । নদনদী, খালবিল,নালা ও পুকুর পেরিয়ে সে ক্রমাগত ছুটে চলেছে- মাকে দেখবে বলে। মা চোখে দেখেনা। সাহেবের পরে অন্য পুরুষে গিয়েছিলো বলে জয়ন্তিয়া, তাকে আগে ঘৃণা করতো । বলতো , তুই শালি শরীরের ক্ষিদের লাগি ঐ ব্যাটার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকিস্ । তোর তো এক বেটি আছে, এই আমি যাকে বেটু বলিস্ ;তবুও তোর পুরুষ লাগে কেন ?

সাহেব ওকে বিয়ে করতে রাজি ছিলোনা কিন্তু সহবাস করতে বা মেয়ের দায়িত্ব নিতে সাহেবের আপত্তি ছিলো না । ডাগর ডোগর মেয়েমানুষকে ,রক্ষিতা করে রাখবেই ভেবেছিলো।

সেই মাকেই দেখতে ছুটে চলেছে জয়ন্তিয়া । অনেক দূরের পথে । ট্রেন, বাস,ট্রাক ,টেম্পো করে যাচ্ছে । হাঁফিয়ে গেলে কোথাও একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার ছুটে চলেছে জয়ন্তিয়া।

বেটু চলেছে মাকে শেষ দেখার জন্য, যাকে এতদিন অনবরত গালি দিয়ে এসেছে-- তুই তুকারি শালি কুতিয়া বলে ।

তারকেশ্বরী

তারকেশ্বরী এখন বৃদ্ধা । আগে খুব চটকদার ছিলো । উত্তর বঙ্গের মেয়ে । লোকে বলতো মিস্ নর্থ বেঙ্গল ।

বহু পুরুষ তাকে কামনা করেছিলো কিন্তু তারা যা ওর ডাকনাম সে কিন্তু মন দেয় এক গ্রামীণ যুবককে । ওর নাম তিলক । তারা জাতে ব্রাহ্মণ আর তিলক স্বর্ণকার । কাজেই বিয়ে তো হবার নয় । তবুও ওকেই কেন যে মনে ধরলো কেউ জানেনা । তারা খুব ছোট বয়স থেকেই কীর্তন গাইতো । বাসায় ছিলো পুজোর চল ।

গানের বাড়িও বটে । সন্ধ্যায় ওদের ঠাকুরের মন্দিরে বসে সবাই কীর্তন গাইতো । ভক্তিরসে ভরে উঠতো প্রাঙ্গন । বাবা মাঝে মাঝে কীর্তনের ফরমাইশ নিয়ে বাইরে যেতেন । সারাটা রাত চলতো গান, কোনো কোনো শিবিরে । বৈষ্ণব-মতে বিশ্বাসী হলেও, এই পরিবারে জাতপাত নিয়ে ভালই মাতামাতি হতো । কাজেই তিলক অন্য জাতের বলে প্রেম ব্যর্থ হল কীর্তন গায়িকা তারার ।

বাংলার এক ঐতিহ্য হল কীর্তন । ওদের পরিবারেও এর চল বহুদিনের । তবুও বরফ গললো না । শেষে এক প্রতিষ্ঠিত পাত্রের গলায় মালা দিতে হল তারাকে ।

অন্যদিকে তিলক ছিলো গাছ কাটাতে বিশেষজ্ঞ ।

ট্রি-সার্জেন বলা যায় । ভারতে এর তেমন চল নেই কিন্তু একটি নতুন সংস্থার হাত ধরে সে গাছ-কাটার ব্যাপারে পারদর্শী হয়ে ওঠে । মরা মহীরুহ কেটে ফেলা যাতে ঝড়ে ভেঙে না পড়ে , ভুল জায়গায় কেউ গাছ লাগিয়ে থাকলে তাকে কেটে ফেলা ইত্যাদি কাজে পটু হলেও নিজের হাইটের জন্য ও চাকরি পাচ্ছিলো না । ও বেঁটে । পাঁচ ফিট দুই ইঞ্চি হবে । গেছো মানুষেরা নাকি অনেক লম্বা হবে । সহজেই উঁচু ডালে হাত পেতে হবে । সিঁড়িও ব্যবহার করা চলে তবে লম্বা হলে অনেক সুবিধে । তাই নিজের উচ্চতা নিয়ে মনে ক্ষোভ

ছিলো তিলকের । অন্য কাজেও মন নেই । যতদিন বাবা ও মা বেঁচে ছিলো ততদিন পরিবারের সাথে থাকতো । পরে ভাইরা ওকে বার করে দেয় । তখন ওর বয়স প্রায় ৪৫ । এরপরের জীবনটা সে কাটায় তারকেশ্বরীর সাথে । ওর স্বামী উজ্জ্বল কুমার, খুব ভালোমানুষ ও সংবেদনশীল । ওদের বাড়িটা কাঠের আর একটু উঁচু । মাটি থেকে বেশ ফিট ছয়েকের মতন উঁচু । সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় বাসায় । দুদিকে সবুজ চাঁদনী আর অসংখ্য তারা আকৃতির বনফুলের সমাহার ।সামনে বারান্দা । সেখানে বসে তিলক, তারকেশ্বরী আর তার স্বামী উজ্জ্বল কুমার আড্ডা দেয় অথবা নিঃস্তব্ধ পরিবেশে ডুব দেয় ।

--কোথায় যাবে আর তিলকবাবু ? বলে হেসে ওঠে উজ্জ্বল । এখানে থাকলে তারারও ভালোলাগবে ।

আর তারকেশ্বরী বলে - আমি তো কীর্তন গাই । আমি মানুষকে তাড়িয়ে দিতে পারবো না । নিজের চেনা একজন মানুষ, শীতের রাতে ফুটপাথে শুয়ে আছে আর আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছি এটা করা অসম্ভব কারণ আমি কীর্তন গাই । মানুষকে যদি ভালোবাসতে না পারি তাহলে কীর্তন গেয়ে লাভ কী ? আর এতো আমার প্রথম প্রেম !

বিবেক

বিবেক মুন্সী ,মানুষটা অদ্ভুত ভালো ছিলো । লাইফ লাইনে কাজ করতো । এদের কাজ, মানুষ আত্মহত্যা করতে চাইলে ততক্ষণাৎ সেখানে হাজির হয়ে তাকে বোঝানো যে এইভাবে জীবন নষ্ট যেন না করা হয় । কেন সে এমন কাজ করতে চাইছে , কেন নিজেকে এইভাবে নির্মূল করে ফেলতে উদ্যত হচ্ছে সেই সমস্যার গভীর গিয়ে তাকে নবজীবন দান করা ।

বিবেক প্রায় সারাটা জীবনই এইসব করেছে । নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার । অনেক মানুষকে বাঁচিয়েছে । তারা নতুনভাবে শুরু করেছে । একদম আয়নার মতন স্বচ্ছ তার দিনলিপি । কিন্তু আয়নার, নিজের স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো কৌতুহল নেই ।

তাই বুঝি একদিন বিবেক নিজেই আত্মহত্যা করে বসে । লোকে বলে যে লাইফ ইন্সুরেন্সের ১৫ লক্ষ টাকা হাতাতে, ওর প্রিয়জনেরা ওকে বাধ্য করেছে এই কাজ করতে কিন্তু বিবেকের বিবেক জানে যে এটা সত্য নয় । আসলে সে জানতে চেয়েছে যে আদার সাইডে কী আছে ? কেন লোকে হেরে গেলে বা দুখী হলে ওদিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে দেয় ? মৃত্যুর পরের সত্য কী ?

লোকে জানে যে আর ফিরবে না এখানে তবুও কোন সে মাধুর্য্যের খোঁজে তারা এক এক করে ওদিকে চলে যায় । পরাজিত হয়ে , অবসাদে ভুগে, আর্থিক অনটন সহ্য করতে না পেরে অথবা নিছকই মোবাইল হারিয়ে ! উত্তরের সন্ধানে ওদিকে পাড়ি দিলেও ওর এই হঠাৎ মৃত্যুকে নিয়ে পৃথিবীতে যথেষ্ট জলঘোলা হয়েছে আর ওর পরিবারকে দায়ী করা হচ্ছে ইন্সুরেন্স পলিসির ব্যাপার স্যাপারগুলো বলে ।

তাহলে কী বিবেক মুন্সী মানুষটি এবার এইদিকে পাড়ি জমাবে, নিষিদ্ধ কোনো অমৃতলোক থেকে ? নাকি আত্মাদের বোঝাবে , পৃথিবী বিষাক্ত , ওখানে জন্ম নিও না !

বিপিন বাবু

বিপিন বাবুর আসল নাম ব্রেন্ডন ইয়াং হো । শর্টে বিপিন আর ভদ্রতার জন্য বাবু জুড়ে দেওয়া হয়েছে ।

চারবার বিয়ে করেছে এই মানুষটি । প্রতিবারই তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে , রাস্তায় । কারণ স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য হলেই তাকে বার করে দিয়েছে , বৌ । সমস্ত মালপত্র নিয়ে , ওর আবার যন্ত্রপাতি কিনে জমাবার স্বভাব আছে বলে লরি বোঝাই করে এইসব নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে পথেঘাটে । আবার নতুন বৌ পেলে থিতু হয়েছে । পেশায় এক মিস্ত্রি এই পুরুষের পঞ্চম সাথী এক বঙ্গতনয়া । তার সাথে আর বিয়ে হয়নি । একসাথে থাকে । মেয়েটি এইদেশে আসে এক সফটওয়্যারের লোকের সাথে বিয়েশাদি করেই । কিন্তু লোকটির লাম্পট্য সহ্য করতে না পেরে সে তালাক দিয়ে দেয় । এক লম্বা বাসজার্নিতে বিপিনের সাথে

আলাপ । পরে একসাথে জীবন শুরু । টানা ১৫ বছর একসাথে আছে । বিপিন পয়সা জমায় না । সব খরচ করে ফেলে । নতুন জিনিস কেনে ; এক জিনিস বেশিদিন ব্যবহার করেনা । পোশাক আশাক ৬ মাসের মধ্যে বদলে ফেলে । একজন মাত্র মানুষের ; লরি বোঝাই করে জিনিস আসে- প্রতিটা বৌয়ের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হবার পরে ।

মধুরিমা , ওর বর্তমান সঙ্গিনীর নাম । সে ওর মাইনে পেয়ে, আর্ধেক অংশ ব্যাঙ্কে জমা করে দেয় ।

পড়শীদের বলে, কানাকড়িও জমায় না । খরচ করে ফেলে । কোনো সেভিংস নেই ওর । আমি ওকে দিয়ে বাড়ি কেনাচ্ছি । মর্টগেজের টাকা ওকে দিতেই হবে । নাহলে আমার পরে যদি কেউ আসে আর সে যদি ওকে আবার বার করে দেয় তাহলে কোথায় যাবে ?

আমি ওকে বলি যে নিজের বাড়ি থাকলে কেউ বার করতে পারবে না । আজও বাড়ি কিনতে পারেনি, টাকা জমায়নি বলে তাই বন্ধুদের বলে , আমি গ্লোব ট্রটার হতে চেয়েছিলাম । কিন্তু কত দু:খে বলে তা কেউ জানে ? হোমলেস্ মানুষ । ভাবো তো আমি না থাকলে এত শীতে ও কোথায় যেতো ? যদি আমিই ফাইনাল সাথী হতে পারি ওর জীবনে, তাহলে সব ঠিক থাকবে নাহলে আমি মরে গেলে অথবা নতুন কেউ

এলে ওর জীবনটা আবার এলোমেলো হয়ে যাবে । কাজেই ওর ঘাড় ধরে আমি মর্টগেজের টাকা আদায় করার চেষ্টা করছি । এরজন্যে একদিন আমি প্যারা মেডিক্সদেরও ফোন করে ডাকি । কারণ আমি ফেক্ মৃত্যুর ভান করে ওকে পরীক্ষা করতে চাইছিলাম যে ওর কী এফেক্ট হয় । তারপর থেকে কিছু কিছু করে টাকা আমাকে দিচ্ছে, বাড়ি কেনার জন্য।

বিপিনের বাবা আর বড় দিদিকে সেবা করে সুস্থ করে তুলেছিলো মধুরিমা । কারণ ওদের দেখার কেউ ছিলো না । মা মৃতা আর দিদি, মাত্র ১৯ বছর বয়সে স্বামীকে হারায়। পরে বিয়েও করে কিন্তু ভদ্রলোক কুমিরের আক্রমণে মারা গেলে আর কাউকে মন দিতে সক্ষম হয়না । নি:সন্তান বলে কেউ দেখার ছিলোনা ।

পুরো পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া- এই ভিনদেশী মহিলার দিকে চেয়ে, নিজের হাতের নখ পরীক্ষা করে চলেছিলো বিপিনি বাবু , একনাগাড়ে । আর গল্পকার ভাবছিলো যে কে বলে ভারতীয় আধুনিকারা আজকাল ঘর ভেঙে দেয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে জীবন কাটাতে পছন্দ করে , কেউ ওদের আপন নয় স্বামীটি ছাড়া , ইত্যাদি ---**নদীর ওপাড়ে দেখো কত্তো বড় একটা সুর্য উঠেছে !**

রসরাজ

রসরাজ- হংস কুমারের নাম, একজন সফল কমেডিয়ান হিসেবে। অসম্ভব হাসাতে পারে সে। অদ্ভুত চোখ মুখ করে Blue comedy ,surreal comedy র জন্য নাম করেছে।

লোকে খুব পছন্দ করে ওকে। তবে বয়সও হয়েছিলো। তবুও পয়সা রোজগারের জন্য স্টেজ শো করতো। কখনো কখনো আবার পথনাটিকার আগে কিংবা পরে লোককে হাসাতো। নিজের একটা গ্রুপ ছিলো।

অনেক লোকের স্বপ্ন সফল করেছিলো হংস কুমার। মুখটা যার ছিলো হাঁসের মতন।

একবার নাকি তার একমাত্র কন্যার এক দুরারোগ্য ব্যাধি ধরা পড়ে। ধার্মিক এই মানুষটি নিয়মিত মন্দিরে যেতো আর একটানা একমাস কাজ বন্ধ করে প্রার্থনা

করতে থাকে এবং মেয়েটি সেরে ওঠে । তাই নিজের রোজগারের একটা বড় অংশ মন্দির কমিটিকে দিয়ে দিতো দরিদ্র নারায়ণ সেবার জন্য । এই মন্দিরে আবার অর্ফ্যান হরিণের জন্য একটা পশুশালা ছিলো । বনের ধারে যেসব হরিণের মা মারা যেতো অথবা শিশুকে ফেলে চলে যেতো তাদেরকে নিয়ে এসে লালন পালন করতো এই মন্দির কমিটি । অনেক অর্থ আসতো সফল কমেডিয়াম হংস কুমারের ভান্ডার থেকে ।

এই অপূর্ব মানুষটির মৃত্যু হয় খুবই অদ্ভুত ভাবে ।

পথনাটিকার শো শেষ হতেই সেদিন হংস কুমার হাসাতে শুরু করে । লোকে হেসে গড়িয়ে পড়ে । চারপাশে জমা হয়েছিলো দর্শক । এমন সময় হঠাৎ-ই মাটিতে পড়ে যাবার অভিনয় করতে শুরু করে --হংস কানফাটা শব্দে হাসতে হাসতে । হো হো হো হো করে । লোকে হাসতে শুরু করে । খুব হাসছে সবাই । একে অন্যের গায়ে চাপড় মারছে ।

হংস মাটিতে শুয়ে হাসতে থাকে । নিজে হাসিয়ে, নিজেই হাসতে শুরু করে সে । দর্শকবৃন্দ ব্যস্ত নিজেদের হাসিতে । অনেকক্ষণ হয়ে গেলেও হংস উঠছে না দেখে লোকে এগিয়ে যায় এবং দেখে যে অতিরিক্ত হাসির ফলে তার মৃত্যু হয়েছে । বেকায়দায় হাসতে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে এই গুণী

কমেডিয়ান । কিন্তু মৃত ঘোষিত হলেও কেউ তাকে তোলেনি । কেউ কাঁদেও নি । এক এক করে সরে গেছে, ঐ এলাকা থেকে । কারণ কমেডিয়ানের কাজ হাসানো । কাঁদানো নয় । তাই লোকে হয় হাসবে নাহলে চুপ করে থাকবে এটাই নাকি নর্ম্যাল ।

লৌহকপাট

লৌহকপাটের আড়ালে বসবাস করে একদল মানুষ যাদের লোকে বলে উন্মাদ । এই আশ্রমটিতে পুজো হয়না ; হয় মারধোর ও অত্যাচার । যদিও পরিবারের অনেকেই ওদের দেখতে আসে তবুও যখন কেউ থাকেনা তখন ওরা অত্যাচারিত হয় । অনেকে আত্মহত্যাও করেছে । পরের দিকে, এখানে কেউ গেলেই নাকি তার সারাদেহে অসম্ভব যন্ত্রণা শুরু হতো । এই ব্যাথার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মিলতো না ।

পরে সরকার পক্ষ থেকে- এই উন্মাদ আশ্রম বন্ধ করে দেওয়া হয় । বেশিরভাগ রুগী ফিরে যায় নিজেদের বাসায় । কেউ কেউ পথে ঘাটে ঘুরতে শুরু করে ।

কেউবা ভিক্ষা করে । এইসব ঘটনার পাশাপাশিই একদিন এক সমাজ সেবক, এই অঞ্চলে এসে পৌঁছান । এতগুলো অসুস্থ মানুষ এইভাবে অত্যাচারিত হয়েছে

আর এখন অনেকেই আশ্রয়হীন দেখে, ভদ্রলোক এবার একটা সত্যিকারের আশ্রম তৈরি করেন-- ঐ উন্মাদ আশ্রমের জমিতে । ভগ্ন দালান, ব্যবহৃত সব আসবাবপত্র, টয়লেট , কিচেন সবকিছু নিয়ে আরেক আশ্রমের সৃষ্টি করা হয় । **অ্যাসাইলাম হয় আশ্রম ।**

উন্মাদ আশ্রম থেকে প্রকৃত আশ্রম ।

আসলে ভারতে, একটি মন্দির আছে যেখানে প্রেত দ্বারা আক্রান্ত মানুষের ওপরে পুজো হয় । সেইখানে গেলে দেখা যায়- বহু মানুষ পাগলের মতন আচরণ করছে কিন্তু আদতে তারা স্পিরিটের দ্বারা নিপীড়িত । ভূতে ধরেছে ওদের । পুজোপাঠ করে তাদের মুক্ত করা হয় ভয়াল প্রেতমুখ থেকে।চীৎকার করে কেউ ; কেউবা অন্যকে আক্রমণ করতে যায় । আর বিজ্ঞান বলে এরা পাগল । অসুস্থ । কেউ সারবে কেউ সারবে না ।

এই অ্যাসাইলামে এসে সমাজ-সেবক যখন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ; তখন দেখা যায় বহু পুরনো রুগী যাদের উনি আবার ওখানে নিয়ে যান, তারা সুস্থ হয়ে গেছে । **আগে ওষুধ ও শক্ থেরাপি করেও যারা সুস্থ হয়নি তারাই যজ্ঞ,হোম্ করে একেবারে সুস্থ মানুষ ।**

পরীক্ষার ছলে করলেও, সমাজ সেবকের এই চিন্তা ভাবনা সাধুবাদ পেয়েছে । কারণ পন্থা যাইহোক্ না কেন, লক্ষ্য হল সুস্থতা । তাই মহাপুজোর দিন, পুরনো রুগীরা -যারা আজ নবজীবন পেয়ে নতুন মানুষ, তারা দলে দলে অন্য ভক্তদের প্রসাদ বিলি করে চলেছে । **আর ভারতের ঐ মন্দিরটির নাম -- মেহেন্দিপুর বালাজি মন্দির ।**

উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে : : :

Mehandipur Balaji Mandir is a noted Hindu temple, mandir in Dausa--district of Rajasthan, dedicated to the Hindu God Hanuman.

The name Balaji is applied to Shri Hanuman in several parts of India because the childhood (*Bala* in Hindi or Sanskrit) form of the Lord is especially celebrated there. The temple is dedicated to Balaji (another name for Shree Hanuman Ji). Unlike similar religious sites it is located in a town rather than the countryside. Its reputation for ritualistic healing and exorcism of evil spirits attracts many pilgrims from Rajasthan and elsewhere.

ক্ষোভ

কর্মরতা নারী বিদিশার কোনো ছেলেপুলে ছিলো না । অনেক বয়স অবধি নি:সন্তান ছিলো, পরে আর বাচ্চা হয়নি । প্রথমে একটি মেয়েকে দত্তক নেবার কথা ভাবে কিন্তু ওর স্বামী প্রদোষ নিমরাজি হওয়ায় সেই প্ল্যান সার্থক হয়না । পরে নানান আধুনিক চিকিৎসায়, মা হল বিদিশা । ঘর ভরে উঠলো নতুন আলোয় ।

বাচ্চাটাকে নিয়েই তার জগৎ । কাজের জায়গাতেও ওকে নিয়ে যেতো । মেয়েই হয়েছিলো । নাম দিলো মৈত্রেয়ী । মেয়েটি খুব চঞ্চল । এক জায়গায় বসতে পারেনা। সবসময় ছুটে চলেছে । কোনো কিছুতে মনোনিবেশ করতে পারেনা । অধৈর্য্য হয়ে পড়ে । ক্লাসে ভালো ফল করতে পারেনা । পরীর মতন সেজে স্কুলে নাচার সময়, আর পাঁচটা বাচ্চার মতন মনে

হলেও আসলে সে একেবারেই আলাদা । এক আজব রোগে আক্রান্ত --যাতে বাচ্চারা ভীষণ চঞ্চলতার শিকার হয়ে ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ে । ধরা যাক্ এই অসুখটার নাম কিং কং ক্রীং ।

বিদিশার মেয়ের নাম মৈত্রেয়ী কিন্তু তার নামী বা বিদুষী হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই ।

একদিন একটি বাচ্চার জন্য কেঁদে বেড়াতো সর্বত্র । আর চাইতো মেয়ে কারণ ওর মেয়েই ভালোলাগে । সাজাবে । খেলাবে । নাচাবে । হলও মেয়ে কিন্তু এ কেমন মেয়ে ? সবসময় ছুটছে ?

শুধালে বলে , মাম্মি আমি বসতে পারিনা । আমার সবসময় ভীষণ কষ্ট হয় । কিছুতেই একটু আরাম পাইনা ।

এখন বিদিশার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । বান্ধবীদের বলে, মেয়ে যদি হল তাহলে এমন মেয়ে কেন হল ? এতো ভোগাচ্ছে আমাদের যে চাকরি জীবনের সাফল্য গুলো পর্যন্ত সাফল্য বলে মনে হয়না । একদিন মধ্যরাতে আমি জল খেতে উঠে দেখি মেয়ে ঘরে নেই । দরজা খোলা । সর্বত্র খুঁজি, কোথাও নেই সে । ওর বাবাকে ডাকি তারপরে দুজনে মিলে খুঁজতে শুরু করি । সবে ভাবছি পুলিশে ফোন করবো এমন সময় দেখি

ও মেন গেট দিয়ে ঘরে ঢুকছে । ও এত রাতে সমুদ্রে সার্ফিং করতে গিয়েছিলো । কারণ ওর মনে হয়েছে তাতে ও একটু আরাম পাবে । **জানিনা ওর আত্মায়, আরামের প্রলেপ দেবার মতন কোনো মলম আজ বাজারে আছে কিনা ।**

ঝঙ্কার

একটি মহিলা-- ঘাঘরা, চোলি পরা আর মাথায় ওড়না দিয়ে ঘোমটা টানা ; একটি মন্দিরের সামনে একনাগাড়ে বসে বসে বিশাল একটি ড্রাম বাজিয়ে গান করে চলেছে । গলায় না আছে সুর না আছে সেরকম কোনো কথার মাধুর্য্য । খুবই গ্রস সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে । ড্রামটি আকারে বিরাট আর খুব হাইট নয় তার । দুই হাতে আঁকড়ে ধরে বাজিয়ে চলেছে ।

পরণে মলিন পোশাক আর পায়ে অসংখ্য গহনা , মল, হাতেও অনেক রূপা ও পাথরের গহনা ।

এই মন্দিরটি মাতা ভূমিদেবীর । এর প্রতিষ্ঠাতা এক সাচ্চা কমিউনিস্ট । কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রলোক এই মন্দির তৈরি করেন এই দরিদ্র মহিলাকে একটি কাজ দেবার জন্য । মহিলার স্বামী পলাতক । ছ-ছয়টি বাচ্চা তার । কয়েকটি নেহাৎই শিশু । মহিলার মুখটা ঘোমটার আড়ালে কারণ মুখটা পোড়া । স্বামী তাকে অ্যাসিড মারে । পোড়া মুখ নিয়ে কোথাও যেতে লজ্জা পায় সে , অথচ এক বিশাল পরিবার তার স্কন্ধে ।

মহিলা, রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে বেসুরো গলায় গান করে আর ড্রাম বাজায় । লোকে ওকে পয়সাও দেয় প্লাস মন্দির থেকে মাস মাইনে পায় কিছু, ভক্তিগীতির জন্য । কমিউনিস্ট মানুষের বক্তব্য যে উনি ভূমিদেবী অর্থাৎ মাদার আর্থের মন্দির তৈরি করেছেন । মাদার আর্থ সত্যি আছেন কারণ তার কোলেই আমাদের বসবাস আবার উনি সেই অর্থে ট্র্যাডিশনাল গডেস্‌ও নন যার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওরা সন্দেহ প্রকাশ করেন । **কাজেই দারিদ্র্যের সাপও মরবে আবার নীতির লাঠিও ভাঙবে না । তাই এইভাবেই বয়ে চলেছে গীতিকাব্য , এক অচেনা ধূসর প্রান্তরে ।**

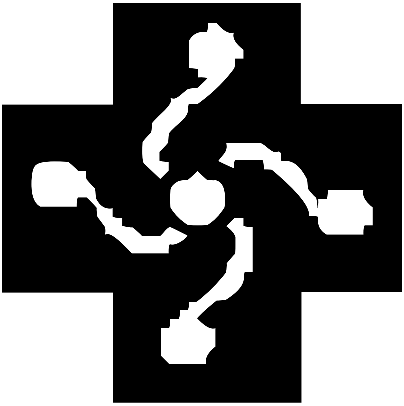

মিডিয়েটর

মোহনা বসু বহুবার ভেবেছে আত্মহত্যা করবে । ওকে দেখতে সুশ্রী তো নয়ই- বরং বেশ খারাপের দিকেই বলে মনে করে অতি বড় মিত্ররাও । মোহনার বিয়ে হয়নি । বয়স প্রায় ৩৫ । কাজ বলতে করে মণিপুর হাউজে কেরানীর কাজ । মণিপুরী রূপসীর মাঝে একজন কুরূপা নারী ; তাই অনেকেই ওকে ব্যঙ্গ করে নানানভাবে , অপমান করে ওর চেহারা নিয়ে, এমনকি এমনও শুনেছে যে লোকে ওর হাতে জল পর্যন্ত খেতে ঘেন্না পায় । বলে , ওর মুখটা পুরো ডিফর্মড্ ।

মনটা খুব ভেঙে পড়ে তাই নিজেকে শেষ করে দিতে উদ্যত হয়েছে বহুবার । শেষকালে একদিন এক বাসস্টপে আলাপ এক মিডিয়েটারের সাথে । আসলে সেদিন মোহনা ভেবেছিলো যে সুন্দরবনে গিয়ে মোহনায় ডুবে মরবে । মিডিয়েটরও বাসে করে ওদিকেই যাবার প্ল্যান করেছিলেন । বাসে ওরা পাশাপাশি বসে যাবার সময় মোহনার সাথে কথায় কথায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক জানতে পারেন যে সে নিজেকে শেষ করে দিতে চলেছে

। মনে তার এত বিষ জমা হয়েছে যে ভদ্রতার খাতিরে অথবা অপরিচিত মানুষ বলে মুখোশের আড়ালে থেকে আলাপ করা এইসব কিছুই আর সত্যকে গোপন করতে পারছে না ।

মিডিয়েটরের কাজ আত্মার সাথে সম্বন্ধ স্থাপণ করা ।

উনি এক স্পিরিচুয়ালিস্ট চার্চের সাথে যুক্ত ছিলেন । বাংলায় এদের সংখ্যা নগণ্য । ভদ্রলোকের কাছে অনেকেই আসতো ভবিষ্যৎ জানতে । উনি তাদের নিরাশ করতেন । বলতেন , আমি কেবল আত্মার প্রেরিত খবর বা মেটাফোর ধরতে পারি আর বলতে পারি । নিজের মনগড়া কথা বলার নিয়ম নেই আর আমি জ্যোতিষীও নই যে ফিউচার বলতে পারবো । আমার কাজ আত্মার পাঠানো মেসেজ, তার নির্দেশ মেনে, বিশেষ কোনো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া ।

মোহনাকে, কিছুটা যেন প্রটেকশান দিলেন মিডিয়েটর, মিস্টার ব্রহ্মচারী। সুন্দরবনের কাছে পৌঁছে একটি নৌকো ভাড়া নিলেন এবং একবেলা সেই নৌকো করে ঘুরলেন মোহনাকে সাথে নিয়ে । কিছু আত্মাকে ডাকলেন । ডেকে দেখালেন যে তারা আজও তাদের সম্পূর্ণ ব্যাক্তিত্ব নিয়েই বিরাজমান কেবল দেহটি নেই । তারা অসম্ভব শান্তিতে আছে । দেহলতা হারানোর জন্য কোনো দু:খ নেই তাদের ।

কোন এক বড় সাধু বলে গেছেন , আফটার ডেথ্ , ইউ উইল নট গ্রিভ লিভং ইওর ফিজিক্যাল বডি বিকজ অ্যাস্ট্রাল ইজ মোর পিসফুল, কোয়াইট অ্যান্ড ভাইব্রেন্ট ।

আসলে মিডিয়েটর ব্রহ্মচারী ,মোহনাকে মৃত্যু ভয় থেকে বাঁচাতে চাননি কারণ সে মরতে যাচ্ছিলো বরং উনি দেখিয়েছেন যে মোহনার স্বরূপ ওর হতশ্রী দেহটা নয় । ও আসলে এক স্পিরিট বা কনশাস্ লাইট যাকে কেমন দেখতে তাই নিয়ে পার্থিব জগতের মানুষ যাই ভাবুক না কেন তাতে ওর আসল অস্তিত্ব একটুও বিকৃত হবেনা । কোনো পরিবর্তন হবেনা। হতে পারেনা ।ও কোনো দৈহিক প্রেজেন্স নয় এক অপূর্ব উপলব্ধি যার কোনো শুরু নেই শেষও নেই ।

মোহনা এরপরে আর কোনদিন ঐ পথিককে দেখেনি কিন্তু এই ঘটনা ওর জীবন বদলে দিয়েছে ।

ও আর কাউকে গ্রাহ্য করেনা । লোকে আজও ওকে ব্যঙ্গ বিদুপ করে কিন্তু ও তাদের ক্ষমার আলোয় ঢাকে । ভাবে , এরা মূর্খ , অবুঝ । বুঝে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে ।

সংস্কৃতি

আজকাল ভারতের দ্রাবিড় প্রান্তরে থাকে, সাহেব ম্যাথু

চ্যান্সার । ম্যাথু ভারতে এসেছে ভেদিক অ্যাস্ট্রোলজি শিখতে । সুদূর ইংল্যান্ড থেকে এই দেশে আসা -- যদিও মানুষ হয়েছে অন্যত্র । London School of Astrology থেকে পাশ করে, ভেদিক অ্যাস্ট্রোলজিতে আগ্রহ বাড়ে । পরে সে এইদেশে পাড়ি জমায় ।।এখন দুবেলা টক্ ,অতিরিক্ত ঝাল আর নানান ধরণের রাইস মানে ভাত খেয়ে দিন কাটায় ।

বলকন্ , বালগেরিয়া থেকে আসা এই মানুষ- শৈশব থেকেই বেড়ে উঠেছে হোয়াইট ম্যাজিক, সাইকিক সার্জেন যারা হাত দিয়ে টিউমার খুলে নেয়, পরীর গল্প ও ইটির আবির্ভাব নিয়ে গল্পগাথা , জ্যোতিষ শ্রাস্ত্রের মধ্যে । কাজেই পরবর্ত্তী জীবনে সে যে এইদিকেই আসবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ।

ভারতে, এক গুরুকূল প্রথায় শিক্ষা দেওয়া মাস্টারের কাছে ইদানিং বসবাস করছে ম্যাথু । ভদ্রলোকের নাম আচার্য শ্রী মল্‌হার (মল্লার) ।

দিন শুরু হয় গ্রহ নক্ষত্র দিয়ে ; শেষ হয় ধ্যানে । আচার্য শ্রী বলেন যে মনে কোনো ক্ষোভ নিয়ে শুতে যাবেনা । মনকে ক্লিন করে ঘুমাতে যাবে তাহলে ঘুমও ভালো ও গভীর হবে । যখন আমরা ডিপ স্লিপে থাকি তখন সবাই শান্তি পাই । তাই গভীর নিদ্রা হলে মন চাঙা হয়ে যায় ।

ম্যাথু, এই দেশে এসে অনেক কিছু বদলে নিয়েছে । পূর্ণিমার রাতে ওদের ওখানে ১৫ কিলোমিটার - মেঠো পথ, লোকে খালি পায়ে হেঁটে চলে পুণ্যের আশায় । ম্যাথু তাতে অংশ নিয়েছে । খায়ও ভাত, সম্বর, রসম্, ইডলি , দোসা ইত্যাদি । মাসের প্রথমে, বস্তা বস্তা চাল কিনে নিয়ে যায় বাসায় । বাসা বলতে এক কামরার এক বাসা, ঐ আচার্য শ্রীর দেওয়া । সেখানে স্বপাক আহার করে । সব রান্না শিখে নিয়েছে । আগে এসব খেতে খুব কষ্ট হতো । তবুও খেয়ে নিতো । একদিন এক সহপাঠী ওকে বলে , এইসব খাবার খেতে পারো ? অসুবিধে হয়না ? আমি হলে পালিয়ে যেতাম ।

ম্যাথু চ্যান্সার হেসে বলে , আগে অসুবিধে হতো । এইসব খাবার পেলে, অপেক্ষা করতাম কবে রবিবার

আসবে । সেদিন বাইরের হোটেলে মাংস খেতে যেতে পারবো -- (আচার্য শ্রী, সপ্তাহে একদিন এই অনুমতি দেন, কারণ বেশি টাইট করলে, শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার আগেই পাখি উড়ে যেতে পারে) কিন্তু এখন এসবই খাই । এমনকি আজকাল শুকনো লঙ্কা আর টক্ দই নাহলে আমার চলেই না, মনে হয় কী যেন খাইনি !

আমি নিজে এখন উত্তাপ্পাম আর আপ্পাম বানাতে পারি । আর আমি কোথাও যাবো না । আমার গার্লফ্রেন্ড এখানে আসবে না বলে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে কিন্তু আমি কোথাও যাচ্ছি না । কারণ আমি এখানে শিক্ষা নিতে এসেছি , দেহের আরাম কিংবা পার্থিব সুখ পাবার জন্য নয় ।

কাঁচের ঘর

দেবারি কোকোনভ থাকে কাঁচের ঘরে । ভদ্রলোক একটি ব্যাঙ্কের উচ্চপদে কাজ করে । স্বচ্ছ তার জীবন-- কোনো স্ক্যাম নেই , নেই কোনো অপরাধ-- এটা দেখানোর জন্যই বোধহয় সে এরকম এক বাড়িতে বসবাস করছে । দুনিয়ায় কোনো কিছুকে যদি সে ভয় পায় তা হল অপবাদ । নিন্দা তাও সহ্য করে নেয় কিন্তু অহেতুক অপবাদের ভয়ে কিছুটা যেন সতর্ক হয়েই থাকে সবসময় ।

দেবারি অর্থাৎ দেবের অরি নাম হলেও লোকটি সত্যি সৎ ও ভদ্রমানুষ বলে পরিচিত । ওর একটা পা নেই । সেখানে ফলস্ পা লাগানো । গট্‌গট্ করে না হলেও স্বচ্ছন্দেই হাঁটে । দেবারি কৌপিন পরে । শীতকালে পরে হাল্কা চাদর কারণ ওটা নাহলেই নয় ।

কেউ যেন ওর কোনো কিছু লুকানো আছে- এরকম মনে না করে । সব পরিষ্কার আছে, আয়নার মতন। অসম্ভব সাবধানে থাকে সে, যেন বদনাম না হয় ।

একদিন এক ব্যাক্তি ওর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনে । অদ্ভুত অভিযোগ ! দেবারি নাকি টয়লেটে বসে বসে, মোবাইল নিয়ে আজেবাজে কাজ করে ।

দেবারির বিরুদ্ধে কেস করেছে সেই লোকটি, সেই চোখে তাকে দেখে ।

দেবারি বুঝতে পেরেছে যে বদনাম বন্ধ করা যায়না । ফেলুদার-- মগনলাল মেঘরাজের গল্প তো জানেনা অবাঙালী কোকোনভ, তাই বুঝি জানতে পারেনি সেই বিখ্যাত ডায়লগটা , **নাম হলেই বদনাম হয় মিস্টার মিটির ।** কোর্টে কিছু প্রমাণিত নাহলেও কোকোনভ সাবধানী ; আজকাল সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাগানে যায় । হাঁটু সমান উঁচু , সবুজ সবুজ গাছের আড়ালে বসে ; এক আশ্চর্য উপায়ে । যাতে লজ্জার অংশটুকু ব্যাতীত আর সবই লোকে পরিষ্কার দেখতে পায় । ও যে কিছু চাপতে ও ঢাকতে চায়না !!!

রবার মানুষ

মাধো সিং একজন রবারের মানুষ । ওর কাজ টায়ার বিক্রি করা ও মোটর সারানো । নিজে টায়ারের দোকান চালায় । আজকাল তো ভারতে বহু দামী গাড়ি চলে । তাই টায়ারের সংখ্যাও কম নয় । আমরা সাধারণ লোকেরা মনে করি টায়ার মানে মোটা রবারের, চাকার জন্য মলাট । কিন্তু বাস্তবে টায়ার নানান ধরণের হয় । **ওয়েট ওয়েদার টায়ার, ইকো ফ্রেন্ডলি টায়ার আরো নানান জাতের সব টায়ারে বাজার ছেয়ে গেছে ।**

মাধো সিং নিজের গাড়ি ব্যবসায়, মানুষকে টায়ার বেচে সাহায্য করে । একটা পায়ে মোটা নকল হাঁটু পরা । তার ওপরে চেপে বসে, গাড়ির টায়ারে হাত দিয়ে দেখছে কতটা ক্ষতি হয়েছে তাতে ।

যে ওর কাছে আসে তাকেই ও টায়ার বদলে নেবার পরামর্শ দিয়ে থাকে । মাটিতে শুয়ে পড়ে, আঙুল

দিয়ে ঘষে ঘষে টায়ার পরীক্ষা করতে অভ্যস্ত মাধোকে, একদিন ওর এক বন্ধু প্রশ্ন করে যে কত গাড়িওয়ালা আসে যাদের টায়ার বদলাবার দরকারই নেই এত ভালো কন্ডিশানে আছে ওগুলো । তবুও তুমি সবাইকে একই পরামর্শ দাও কেন ?

মাধো হেসে ওঠে । পাকোড়া খাচ্ছিলো গরম চায়ের সাথে । ফুলকপি, ক্যাপসিকাম্ আর ব্যাঙের ছাতা মানে ফাঙ্গাসের পাকোড়া । সঙ্গে রায়তা আর ঝাল ঝাল টমেটো সস্ । খানা শেষ করে বলে ওঠে গলা ঝেড়ে , ---বুঝলে হে , সবাইকে সৎ ও সঠিক পরামর্শ দিলে তো আমার দোকান লাটে উঠবে । তাই ওগুলো বলি । আর লোকে বদলেও নেয়, আমার বাজারে এমনই নাম আছে । সততার মুখোশ পরে বসে, অসৎ পরামর্শ দিই কিন্তু কেউ সেকেন্ড অপিনিয়ন নিতেও যায়না । আমার কথাই ওদের কাছে বেদবাক্য । অনেক খেটে, এমন রেপুটেশান কামিয়েছি । কাজ ভালো করি । একবার গাড়ি সারিয়ে দিলে আর সহজে খারাপ হয়না । নামী মোটর গাড়ির গ্যারেজগুলো থেকে ; গাড়ি সারাতে কম টাকা নিই । আর টায়ারের বেশি দাম নিইনা বরং ঘন ঘন বদলাতে বলি । কিন্তু খেয়াল করে দেখবে আমি ততটা অসৎ নই । ওদের বিলের পেছনে খুব ক্ষুদ্রাকারে লেখা থাকে যে এই টায়ার না বদলালে আগামি ২/৩ বছর পরে সমস্যা হতে পারে ------ওরা

কেউ সেটা নিশ্চয়ই আজও দেখেনি । দেখলে কি আর আসতো ? আর দুনিয়ায় সবকিছুই পজিটিভ আর নেগেটিভ শক্তিতে চলে । আমি যেমন এটা করি সেরকম নিঁখুত মোটর সার্ভিসিং করে দিই । তাই লোকে সন্দেহও করেনা । চাঁদেরও তো কলঙ্ক আছে কী বলো ?

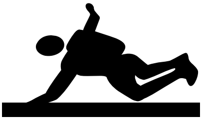

সেই মেয়েটা

আদিবাসী মেয়ে সাহেরা ; খুব ভালো মেক আপ করতে পারে । এমন সুন্দর সাজাতে যে কেউ পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত । সুন্দর সুন্দর খোঁপা বাঁধা , কোন গয়না পরলে মানাবে ভালো , কন্ট্রাস্ট কালারের শৈল্পিক টিপ ও অলঙ্কার পরার কল , ট্র্যাডিশনাল ও ফ্যান্সি শাড়ির সাথে কেমন সাজ মানাবে, বোঁচা নাক চোখা করা, সরু চোখ মৃগনয়ন-- সবই তার নখদর্পণে । **রূপের কারবারি মেয়েটি যেন জন্ম নিয়েছে মানুষকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করার জন্যই ।**

অনেকে ওকে বলেছে প্রফেশন্যাল কোর্স করে মুভিতে যোগ দিতে । ওখানে মেক আপের খুবই রমরমা । **এক একটি মেক আপ করে দিতে পারে -পা সিনেমায় মিস্টার বচ্চনকে অভিনব এক চরিত্র অথবা আমজাদ**

খানকে গব্বর সিং কিংবা হট নায়িকা ডিম্পল কাপড়িয়াকে, ভিল রমণী !

অনেক আশা নিয়ে গেলেও মুম্বাইয়ের সিনেমা জগৎ- এ ঠাঁই পাওয়া সহজ নয় । কপাল চাই , ব্যাকিং চাই । সাহেরার ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হলনা । বেশিদিন একা, এক আদিবাসী মহিলার পক্ষে শহরে থাকাও সম্ভব নয় । মেয়েরা একা থাকলে লোকে তাকে ছিঁড়ে খেতে চায় বিশেষ করে সে যদি যুবতী হয় ।

ওকে দেখতে মন্দ নয় তবে চেহারায় বনজ পরশ । ঘোর কৃষ্ণবর্ণ , মোটা ঠোঁট , টানা টানা সরু চোখ আর সাদা ঝকঝক দাঁতের সরল হাসি ।

স্বপ্ন তো সবার সফল হয়না তবুও একবার শেষ চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ? তাই এক মেক-আপের মানুষ, বলা ভালো মানুষী -ওকে দয়া দেখিয়ে নিয়ে গেলো এক নাট্য কোম্পানির কাছে । ওরা নিয়মিত স্টেজে শো করে । একটি ড্রামা কোম্পানির পরিচালিকা, সাহেরাকে মাস মাইনে দিয়ে কাজে নিতে রাজি হয় কিন্তু চাকরাণী অথবা গ্রাম্য বধূর রোলে । সাহিরাকে ওর উপদেষ্টা মহিলা বলে , নিয়ে নাও । খেয়ে পরে বাঁচলে মেক আপ হবে ।

সে ভেবে দেখলো প্রস্তাবটা মন্দ নয় । তাই রাজি হয়ে গেলো । শোয়ের ফাঁকে ফাঁকে মেক আপে হাত লাগাতো । রোজ তো ওর অভিনয় থাকতো না ! আর বেশি বড় রোলও পেতোনা । তবে মাইনেটা নিয়মিত আসতো তার হাতে । সেখানে কোনো কারচুপি ছিলো না । ধীর ধীরে সে মেক আপের টুকিটাকি শিখে নিলো ।হাত পেকে গেলেও কাজ তো নেই তাই সরাসরি কাউকে সাজাতে পারেনা । শেষে ছোটখাটো বিয়ের আসরে যেতো মেক আপ বক্স নিয়ে ।

****

একদিন ওদের দলের এক বৃদ্ধ ওদের পরিচালিকাকে বলে ---ম্যাম, সাহিরাজী তো খুব ভালো মেক আপ করে , ওকে দিয়েই মেক আপ করান। আমাদের মেক আপ ম্যানের থেকেও ও ভালো কাজ করে । আর ও তো রোজ অভিনয় করেনা । কাজেই মেক আপ ম্যানকে ছাড়িয়ে দিলে অনেক টাকা বাঁচবে ।

ম্যাম বলে ওঠে মারাঠিতে, **তু ভেড়া আহেস্ (তুই পাগল) ! ও জিনিয়াস হলেও ওকে আমি মেক আপের কাজে নিতে পারিনা । একটা ট্রাইবাল , ছোটলোক সাজসজ্জার কী জানে ? আমার নাট্য দলের জাত যাবেনা**

?ব্রাহ্মণের থেকে কেবল নিচুই নয় একেবারে আদিবাসী ! ওর যোগ্যতা থাকলেও রুচি আছে ? <u>দেখেছে কোনোদিন রুচিপূর্ণ কিছু যে মেক আপে তা ফুটিয়ে তুলবে ?</u>

<u>পার্টি</u>

পার্টিটা কিসের জন্য দিয়েছিলো শ্যামসুন্দর ওঝা, জানি না । আমরা এক শনিবার সন্ধ্যায় ওর বাসায় গেলাম ।

বাংলো ধরণের বাসা । আজকাল ওকে ভুগে দেখি । রোজ দেখা সাক্ষাৎ হয়না । কিন্তু কখন কোথায় যায় , নতুন গাড়ির পুজো দেয় , কখন কী খায় সবই আমার

জানা। ওর স্ত্রী অলকাতিলকা, সমস্ত ডিটেলে দেখায় ওর ভ্লগে। রূপচর্চা করা , আলমারিতে কম জায়গায় জিনিস সাজানো, আন্ডার গার্মেন্টস্ গোছানো ,ফ্রিজ ক্লিন করা , ব্রেকফাস্টে কী রান্না করা চলে সহজেই , উপাদেয় উইক-এন্ডের খানা সবই আমাদের জানা হয়ে যায় ওর ভ্লগ দেখে । ফেসিয়াল করে দেখাচ্ছে । একজন টিপ্পনী কাটে --এত সেজে কী হবে ? ওজন কমাও। মাসাজের সময় মুখটা দেখে মনে হচ্ছে, সুমো রেস্লারের মুখ ! থরথর করে কাঁপছে !

এসব চলতেই থাকে ।

আসলে পাশের বাড়িতে তিন তিনবার মোট ভাড়াটে বদল হলেও আমি জানতে পারিনি সারাটাদিন ভ্লগ আর মোবাইলের হোয়াট্স অ্যাপ নিয়ে মেতে থাকায় । সকালে উঠেই ওগুলো খুলি। পরে, দিন গড়ালে ভ্লগ।

ওর বৌ সকালে উঠে স্নান করাও ভ্লগে দেখায়। মানে ঢোকা আর বেড়োনো পর্যন্তই ব্যাপারটা সীমিত আছে। কখনও বা বাথটাবে শুয়ে থাকে ফেনার মধ্যে সেটাও দেখায় । একবার তো শ্যামসুন্দর ওর স্ত্রীর, শয্যায় নগ্ন হয়ে শুয়ে থাকা ছবি তুলে দিয়েছিলো ইন্সটাগ্রামে । লোকে খুব বাহা বাহা করেছিলো । কারণ

ক্যাপশানটা এমনই ছিলো । শিল্পীর মডেল যেমন ! বিবসনা হয় কিন্তু ওটা আর্ট । সেরকম শ্যাম ওর বৌয়ের ফটোর নিচে লেখে , অনাঘ্রাতা প্রকৃতি!

একজন অবশ্যই দুষ্টুমি করে কমেন্ট দেয় , দাদা ইনি আপনার বৌ নন ? আরেকজন লেখে -- ঘন বনের প্রকৃতি । দাদা, বৌকে পিটি/ ফিউশান ডান্স করান না ???

আসলে অলকাতিলকা একটু স্থুলকায়া আরকি !

যাইহোক্ ,পার্টি কিসের জানিনা আর কে আসছে তাও জানিনা । আর আমি তো ঘোড়ার ডিম বাসা থেকে এক পাও নড়িনা ! ঐ ভ্লগ আর ফেসবুক-ফুক নিয়েই জমিয়ে দিন কাটাই । অনুষ্ঠানের কথা ভ্লগে বলেনি । সারপ্রাইজ !

দেখি, ওর বৌ অপরূপ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে । সবার হাতেই প্রায় ওয়াইন আর বিয়ার , কেউ বা চা পানে ব্যস্ত । অনেকে টিপ্পনী কাটছে , কি হে নিরামিষ খাবো নাকি ? কেউ কেউ অন্যের স্ত্রীকে বুকে টেনে কথা বলছে । কেউবা রূপসীদের ফ্রি-হাগ্ দিচ্ছে, একজন কুশ্রী এগিয়ে গেলে বলে ওঠে--পার হাগ্ এত টাকা নিই ! সে এলাহি কান্ড । ব্যান্ড আনা হয়েছে । লোকাল এক নর্তকী এসে জ্যাজ ফ্যাজ রাম্বা সাম্বা করছে ।

এতকিছুর মাঝেও বোঝা গেলো না অনুষ্ঠানটা কিসের ।ফেরার সময় অবশ্য জানা গেলো ।

সবাইকে একটা করে কার্ড দেওয়া হল যাতে লেখা আছে যে শ্যামসুন্দরের স্ত্রী স্টেজ ফোর ক্যান্সারে আক্রান্ত । আয়ু মাত্র তিন থেকে চার মাস । এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে ওকে চিয়ার আপ করার জন্য ।

তাই বুঝি মনে হল হঠাৎ সে অনেকটাই শুকিয়ে গেছে । কুস্তিগীর বলে আর মনে হচ্ছে না তাকে ।

চোখে জল এসে গিয়েছিলো !!! আর মনে মনে ভাবলাম, **সার্থক জনম তোমার, জন্মেছো ভ্লগের যুগে !**

আরো ভ্লগ করো সমস্ত খুঁটিনাটি দিয়ে । আমি সব দেখবো, তোমাকে চেটেপুটে খাবো যখন পড়বে না তোমার পায়ের চিহ্ন চাঁদে বা মঙ্গলে । তোমাকে খুব মনে করবো আর চিরটাকাল জীবন্ত দেখবো , ভ্লগের আলোছায়াতে ।

এন আর আই মেয়ে

এন আর আই মেয়ে তিত্লি খুবই আদুরে । বাবা বুধন আর মা নির্মালি ওকে খুব যত্নে রাখে । দুজনেই বড় চাকরি করে । তবুও মেয়েকে সময় দেওয়া , তাকে নিয়ে বেড়ানো এসবই করেছে ওরা । ওদের আরেকটি বাচ্চা আছে । ছেলেটির ফস্টার বাবা/মা হিসেবে ওরা, ওকে কিছুকাল লালন পালন করেছিলো । পরে ওকে ওর আসল মা নিয়ে যায় । মা তখন পড়তে গিয়েছিলো, তাই কৈশোরে জন্মানো বাচ্চাকে নির্মালিদের কাছে দিয়ে যায় ।

সবাই মিলে হিমালয়ে বেড়াতে গেছে । ছেলের নাম চন্ডিল। সে মাঝে মাঝে মা চন্ডিকার কাছ থেকে এই পালিত বাবাদের কাছে এসে থাকে । খুব ভালোবাসে ওদেরকে আর ওরাও ছেলের জন্য পাগল । তিত্‌লির সম্প্রতি খুব দু:খ হয়েছে । ওর বাবা ওর মনোমত বাড়ি কেনেনি । ওর ইচ্ছে ছিলো সুইমিং পুল আর বিরাট বাগান সমেৎ একটা বাড়ি ওরা কিনুক কিন্তু বাবা অনেক ছোট বাড়ি কিনেছে। ওর ইচ্ছে ছিলো ওদের সারাটা বাসা তা ভেতর বা বাইরে যাইহোক না কেন উজ্জ্বল রং দিয়ে রং করা হবে । আসবাবপত্র , দেওয়াল, মেঝে, বেসিন, কমোড সব হবে ব্রাইট কালারের । কিন্তু বাবা ও মা সেরকম চায়নি । বিশেষ করে বাবা একদম রং ভালোবাসে না । ওর দুনিয়াতে চারটে মাত্র রং আছে । সাদা, কালো, বাদামী আর ধূসর । ওর জামা, ব্রিফকেস, টিফিন কৌটো, টাই , প্যান্ট এমনকি ঘড়ির ব্যান্ড ও চিরুনি পর্যন্ত এই কটি রং এর । **নিজের ইমেল আর স্কাইপ আই ডি তেও ডার্ক অ্যান্ড হোয়াইট কিংবা গ্রে কালার এইসব ওয়ার্ড ব্যবহার করে বাবা ।**

তিত্‌লির মন ভেঙে গেছে । এ কেমন মানুষ ? দুনিয়ায় রং না থাকলে কেমন লাগে ? ফুল, পাখি, বসন্ত, হোলি সবই তো রং এর খেলায় মাতে ।

মন খারাপের পালা শেষ হয়না তবুও বেড়াতে যেতে হয় । হিমালয় সাদা তাই বাবার প্রিয় । অন্ধকার ঘরে বসতে ভালোবাসে বাবা । আলো নিভিয়েও বসে থাকে । বাবা ওকে যখন জিজ্ঞেস করে যে বাসা পছন্দ হয়েছে কিনা ও সাফ জানিয়ে দেয় যে এরকম সাদা-কালো চেস্‌ বোর্ডের মতন বাড়িকে ও একটা জেব্রা ক্রসিং বলতে পারে, বাড়ি নয় ।

হিমালয়ে গিয়ে ওরা সারাদিন ট্যুরে ট্যুরে কাটায় । একটি গাড়ি ভাড়া নেয়, যার সারথীর নাম পরাগ । পরাগ, অনেক দূরের পাহাড় থেকে নাকি হেঁটে আসে, গাড়ির ট্র্যাভেল কোম্পানির অফিসে । রোজ ভোর চারটে নাগাদ শুরু করে হাঁটা । তারপর ছটা নাগাদ এসে পৌঁছায় । শীতকালে, রাতে অনেকদিন অফিসে শুয়ে থাকে । বাড়িতে আছে বুড়ি মা । সে বনের কাঠ কেটে আনে আর তাই বিক্রি করে । ছোট একটা ভাই আছে সে নাকি কাছের কোনো দোকানে ম্যাগি বানায় । ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার । তাই পরাগকে আসতেই হয় । এতটা হেঁটে ।

একদিন ওর বাবা ওকে কিছু টাকা দিয়ে বলে-- যাবার আগে ট্রেক করে তোমার বাড়ি যেতে চাই । এত সুন্দর রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসো তুমি ; আমরাও দেখতে চাই ওদিকটা ।ওদিকে গাড়ি যাবার রাস্তা নেই বলেই সবাই ট্রেক করে যাবে । চোখের দুই পাশ কুঁচকে হেসে ওঠে পরাগ । তারপর ওদের নিয়ে যেতে রাজি হয়ে যায় । অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয় ওদের । এতটাই যে মাঝে একটা উঁচু জায়গায় বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নেয় আর ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে কফি খেয়ে নেয় ।

এরকম করে অনেক চরাই উৎরাই পেরিয়ে ওরা হাজির হয় পরাগের বাড়ি । ওর মা , মল্লিকার সাথে আলাপ হয় । আলাপ হয় ভাই পীতম্বরের সাথে ।

আর বাসাটি সত্যি দেখবার মতন । পাহাড়ের গায়ে, গভীর খাদের ওপর ঝুলন্ত একটি ভাঙা কাঠের ঘর । পাশে একটি টিনের টয়লেট । একদিকে ঝর্ণা থেকে আসা জলের পাইপ । ব্যস্ ! এই ওদের বাড়ি ।

তাজ্জব হয়ে যায় তিত্‌লি । ওর মা ওদের জন্য খাবার আনে । মধু দিয়ে দই আর শুকনো লঙ্কা দিয়ে চিঁড়ে ।

জানা যায়, এই এক চিল্‌তে বাড়ির পেছনে অল্প জমিতে, ওরা সবজি চাষ করেছে নাহলে খেতে পাবেনা । জমি নামেই জমি, আদতে পুরনো বাল্‌তির নানান

টব। সেখানে নানান সবজি ফলেছে । ওরা রোজ **ডাল ভাত তরকারি** খায় । তরকারির সবজি আসে, এই পাহাড়ের খাদে হওয়া, ঝুলে পড়া ফসল থেকে । পরাগের মা অবসরে চাষ করে ।

অন্যসময় ওরা খায় চিঁড়ে, মুড়ি, দই, মধু, আর শহুরে বিস্কুট । উৎসবে, মোমো, ন্যুডুলস্ , স্যুপ । এগুলো ওর ছোট ছেলে নিয়ে আসে দোকান থেকে, যেখানে ও কাজ করে ।

এই জীবন ; বিশেষ করে এই বাসাটি দেখে তিত্‌লি মোহিত । বাসা মানে বুঝি ইমারৎ নয়- এমন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এদের জীবন তবুও পরাগের ভাই , মা আর পরাগ হাসছে । ওরা সুখে আছে কারণ ওদের চোখে তিত্‌লির মতন রঙীন স্বপ্ন নেই, তাই নেই অহেতুক নয়নে ঝিলমিল লাগার ভয় । ওরা বিন্দাস্ আছে ছায়াতে , খাদে, এক চিল্‌তে রোদে--ওদের জীবন ঝাক্‌কাস নয়, বিকেলের মরা আলোর মতন--তবুও ওরা কেমন জীবন্ত আছে !বন থেকে কাঠ কেটে আনা ওর মা মল্লিকা, নুয়ে পড়েছে পিঠের বোঝার চাপে । তবুও কত জ্যান্ত আছে !

(মল্লিকা -বা মালিকা-ওদের দেশে এক দেবীর নাম)

সুযোগ সন্ধানী

অজিত রাহা একজন প্রতিষ্ঠিত নৃতত্ত্ববিদ্ । মানুষ নিয়েই তার কাজ কারবার । বহুকাল সে কাটিয়েছে আদিম মানুষের মাঝে । ওদের জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করে । যদি বয়স তার হয় ৫০ বছর তো তার মধ্যে সে ৩০ বছরই ওদের সঙ্গে থেকেছে । বাড়িতে এসেছে হয়ত বছরে দুবার । দু-একদিন থেকে আবার ফিরে গেছে ওদের মধ্যে । **ওদের সাথে থেকে থেকে Entomophagy তে আসক্ত হয়ে নিয়মিত পোকামাকড় খেয়েছে ।** আজকাল নৃতত্ত্ববিদ্যার আরো অনেক বিভাগ হয়েছে -মেডিক্যাল, পরিবেশ সংক্রান্ত , Cyborg --ইত্যাদি কিন্তু অজিত, সরাসরি মানব গোষ্ঠি নিয়ে কাজ করেছে । বাসায় যে একজন স্ত্রী আছে যে রক্তমাংসের মানবী আর তারও প্রেম, মায়া , শরীর সবই আছে সেটা জেনেও কেন যে অজিত তাকে উপেক্ষা করেছে কে জানে ।

একটাই মেয়ে। তাকে তার মা স্কুল টিচার বানিয়েছে। বলেছে , **বাবার মতন এসব করতে হবে না। একজন লাভিং মাদার আর ওয়াইফ হবার চেষ্টা করো । যে নিজের স্ত্রীকে মর্যাদা দেয়না তার আর মানব জমিনের খবর নিয়ে কী হবে ? মেয়েদের যারা অসম্মান করে, তাদের পরিবার ধবংস হয়ে যায় ।**

মেয়ে, তার বাবাকে ভালোবাসলেও খুব মিস্ করেছে বেড়ে ওঠার সময় । মায়ের কথা শুনে সেও একজন শিক্ষিকা হয়েছে। সুখের চেয়ে শান্তি ভালো।

অজিত কিন্তু বিপদে পড়লে, সবসময় তার বৌয়ের কাছে ফিরে আসে । অন্যসময় বৌয়ের কথা মনে তো পড়েই না আর চিঠিও লেখেনা। **বলে চিঠি লেখা নাকি দুনিয়ায় সবচেয়ে কঠিন কাজ ।**

মাঝে মাঝে মাইনের কিছু টাকা অবশ্যি পাঠিয়ে দিতো বাড়িতে কিন্তু ঐ অবধি । স্ত্রী নিজে এন-জি-ও তে কাজ করে মেয়েকে বড় করেছে। অজিত একধরণের বেপাত্তাই ছিলো সারাটাজীবন । তবুও বিপদে পড়লেই ফিরে এসেছে বাড়ি । আর পত্নী দোলনচাঁপাও তাকে ফেলতে পারেনি । মেয়ে অনেকবার চেষ্টা করেছে বাবাকে ঘরে বেঁধে রাখতে---- কিন্তু বাবা মাঝে মাঝেই

উধাও হয়ে গেছে । খবরের কাগজে বাবার নাম পড়েছে কিন্তু বাড়িতে ফেরেনি পিতৃদেব । একদিন, দুইদিন, তিনদিন নয় , কয়েক বছর ধরেই ।

প্রশ্ন করলে বলেছে , বিটিয়া (ওর ডাকনাম) আমি মানুষ খুঁজি , ওদের বুঝি । তাই বাড়িতে থাকতে পারিনা ।

মেয়ে ,পরে তার মাকে সরল প্রশ্ন করেছে , মা আমরা কি মানুষ নই নাকি বাবাই(বাবাকে ডাকে) এর, আমাদের কে বোঝা হয়ে গেছে ?

XXXXXXX

ঝি

ঝিয়ের মেয়েকে খুন করেছে বাড়ির বাবু । কিন্তু এটা কোনো রেপ কেস বা রাগের মাথায় খুন নয় ।

বাবুমশাই, দরদী বলেই পরিচিত ছিলো খুনের আগের মূহুর্ত অবধি । কিন্তু কী যে হয়ে গেলো !

কাঁচের চুড়ি পরা মেয়ে লালিয়াকে মেরেই ফেললো বাবু প্রজ্জ্বল । প্রজ্জ্বল এক সরকারি চাকুরে । ওর এক মাত্র

মেয়ে উত্তরা, বসেছিলো এক দামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরীক্ষায় । **নিও ন্যাশেনাল ইন্সটিটিউট অফ্ ডিজাইনের** পরীক্ষায় বসলেও তাতে চান্স পায়নি । ডিজাইনার হবার ইচ্ছে ছোটবেলা থেকেই । নানান আকৃতি নিয়ে খেলা করতো । খুব ছোট থেকেই নানান রং শনাক্ত করতে পারতো মেয়ে । সবাই ভাবে যে এই মেয়ে হবে এক প্রসিদ্ধ ডিজাইনার ।কিন্তু বাস্তব কঠিন ।

ঝিয়ের মেয়ে লালিয়া, কী করে বসলো এই পরীক্ষায় তা চমকপ্রদ । সেও চমৎকার আর্ট পারে । ঝিয়ের মেয়ে হলেও এস্থেটিক্ সেন্স তার অসাধারণ । এমন সুন্দর রঙ্গোলি বানায় যে দেখে দেখে চোখ ফেরানো দায় । মন ভরে যায় ওর ফুলমালা গাঁথা দেখে । রং মিলিয়ে , ডিজাইন করে করে তৈরি করে অপূর্ব সেসব মালা । এইসব দেখেই, অন্য এক বাড়ির মালকিন যার নাম মল্লিকা হলেও মালাইকা ; উচ্চারণের জন্য (Mal-li-ka= মাল-লাই-কা) সে একটি ব্লগে ওর কথা লেখে । একটি দরদী সংস্থা ওকে ঐ পরীক্ষায় বসতে সাহায্য করে । **এদিকে বাবুমশাই ক্ষেপে ওঠে ।**

তার মেয়েকে, কত যত্ন করে গড়েছে আর এই সামান্য ঝিয়ের মেয়ে কী করে এত অযত্নে থেকে , এত অবহেলা পেয়েও এরকম ডিজাইন করতে সক্ষম হয় ?

একটা বস্তিতে বড় হয়ে, সারাদিন জল আর বাথরুম নিয়ে খেয়োখেয়ি করেছে , লাউ সেদ্ধ করে সর্ষের তেল দিয়ে মেখে খেয়েছে, কখনো আলু সেদ্ধ ভাত এই তো ? তার এত ডিজাইন সেন্স এলো কোথা থেকে ? আর ঘুষ দেবার ক্ষমতাও নেই, কাজেই যোগ্যতাতেই পেয়েছে কিন্তু কী করে এটা সম্ভব ?

উত্তর না পেয়ে ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়েই দিলো ।

সেলিব্রিটিদের, কবর থেকে তুলে মৃত্যু তদন্ত করা হয় কিন্তু এর ক্ষেত্রে কেউ জানলো না , পুলিশ ছাড়া । এও তো হতে পারতো সেলিব্রিটি ! মৃত্যু কি সবসময়ই দু:খের নয় ? নখদাঁত বার করার পরে অবশ্যই চেতনা ফেরে বাবুমশাই- এর। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে । আর তার মেয়ে, ডিজাইনে চান্স না পেয়ে আর বাবার এই কীর্তি দেখে যোগ দিয়েছে সাইকোলজি কোর্সে । **মানব মনের গহীনে কী ডিজাইন আছে হয়ত সেটা জানতেই ।**

দু -হাত ভরে, দেয় ফুল

গ্রামের পথে, সকালে দেখা যায় এক মহিলাকে । নাম চন্দরী । চন্দরী রোজ সকালে মানুষকে দুই হাত ভরে ফুল দেয় । শুধু ফুল । কোনো পয়সা নেয়না । নিজে খুবই গরীব । ফুল দান করা হয়ে গেলেই গভীর বনে ঢুকে যায় । সেখানে নদীর জলে স্নান করে, মলিন পোশাক ধুয়ে নেয় । চুল ভিজিয়ে স্নান করে বলে, রোদে চুল শুকাতে সময় লাগে ; তাই বিকেল হয়ে যায় ফিরতে ফিরতে ।

লোকালয়ে ফিরে ; একটা সরাইখানার জমানো খাবার যা অতিথিরা ফেলে দিয়ে গেছে, তাই খায় । মালিকেরাই দেয় ওকে নিয়মিত । বদলে ও ফুল দেয় ।

রাতে কোনো ভাঙা দালানে, পরিত্যক্ত মন্দিরে অথবা বাসস্টপের মধ্যে- সিমেন্টের বেঞ্চির নিচে শুয়ে থাকে, পথচারী সারমেয়র সাথে ।

<u>**চন্দরী কে? তা সে নিজেও জানেনা ।**</u> কোথার থেকে এসেছে , কোথায় যাবে ইত্যাদি । শুধু মনে পড়ে খুব ছোটবেলায়, ওকে ওর মা- এক বাসস্টপে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় । কেন তাও স্পষ্ট করে কিছু মনে করতে পারেনা বা বোঝেও না ।

সেই থেকে বড় হয়েছে মানুষের এঁঠো খেয়ে খেয়ে । তবে একটা শখ আছে ওর । নাকছাবি পরার । দেহের মধ্যে কোনো ধাতু না থাকলে নাকি- বেশি আনন্দ হলে লোকের মরণ হতে পারে । এটা ওকে ওর মা শিখিয়েছিলো । তাই ওর গলায় একটা রূপার মোটা হার ছিলো যা পরে ও বেচে দেয় । মা ওর মরণ চায়নি কিন্তু নির্দয় জগতের বুকে একা ছেড়ে দিয়েছে । কেন ?

এখন পোশাক বলতে দুটি শাড়ি আর ব্লাউজ আছে । দুটো একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে । একটা কেচে রোদে মেলে দেয় । আবার শুকিয়ে গেলে অন্যটা কাচে । ভাগ্যিস্ এই এলাকায় গরম বেশি- তাই পথে শুয়েও দিব্বি কেটে যায় । আসলে গরমে খোলা আকাশের নিচে শুতেই ভালোলাগে । কুকুরেরা ওকে পাহারা দেয় ।ওর ছেঁড়া পোশাক ; পাথরের আড়ালে শুকাতে দেয় ।

একবার একজন ব্যঙ্গ করে -- তোমার শাড়িগুলো ঐশ্বর্য রাইকে পাঠিয়ে দাও ।

কিছু মানুষ কাঁটা ফুটাতে , কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতেই ভালোবাসে । চন্দরী কিছু মনে করেনি ।

ওকে খেতে দেয় সরাইখানা । ওরা চ্যারিটি করছে । কিছু নষ্ট হতে দেয়না ওরা । বিবেক ওদের সাফ ।

এঁঠো খেয়ে ভালই তো আছে । সুস্থ আছে , বেঁচে আছে ।

ঝরা ফুল কুড়িয়ে আনে ; বাসিন্দাদের বাগান থেকে অথবা বন থেকে নিয়ে আসে সুগন্ধী বনফুল । তারপর রোজ সূর্যোদয়ের রং মেখে, লোককে বিলি করে সেইসব ফুল । দুহাত ভরে । প্রতিদিন। **চন্দরী নামক এই চালচুলোহীন নারী ।**ক্ষয়াটে চেহারা , অর্ধমানবীর দেহ ঢাকা ছেঁড়া কিছু পোশাকে , হাত-গলা-কান শুন্য

কেবল নাকে বড় একটা সোনার নাকছাবি । নাকছাবি পরতে খুব ভালোবাসে সে ।আর জীবনে একবারই চুরি করেছে । তা হল এই নাকছাবিটা । সরাইখানার ঘরে পড়েছিলো । কোনো অতিথি ফেলে গিয়েছিলো । ও খাবার আনতে গিয়ে পায় । কিন্তু ফেরৎ দেয়নি । একদিন এক মহিলা, ফুল নেবার সময় সেটা শনাক্তও

করে। ওকে মোবাইলে নিজের ছবি দেখিয়ে বলে , এই দেখ্! এটা আমার নাকছাবি।

কিন্তু সরাইখানায় কমপ্লেন করেনা। বরং ওটা চন্দরীকেই দান করে দেয় কারণ চন্দরী রোজ সকালে অকাতরে পুষ্প বিলায়। ফুলের গন্ধ নাকি সেই মহিলার খুব ভালোলাগে। স্নিগ্ধ হয় মন। রাতে ঘুম হয়না তার। মার্কেটিং বিভাগে কাজ করে। হাই টেনশন জব্। বস্, দাঁতের আগায় রাখে। সকালে এইটুকু ফুল ফ্রিতে পায় আর তাতেই ওর মনটা ভরে যায়। তাই চোর চন্দরীকে ও ক্ষমা করে দেয়, বলে ---তুই আমাকে এত সুগন্ধী করেছিস্ !!

আর মজার ব্যাপার হল মহিলা যখন জানতে পারে যে নাকছাবি প্রীতির কারণে চন্দরী ওটা ফেরৎ দেয়নি --কারণ ও একটা ধাতু রাখতে চায় দেহে- যাতে বেশি আনন্দ হলে মরণ না হয়, আর নাকছাবিই একমাত্র বস্তু যা ওর পরতে ভালোলাগে তখন সেই মহিলা ওকে আরো একটা কিনে দিয়ে যায়। **এটা প্রেশাস্ স্টোনের আর সাইজে আরো অনেক বড়। নথের মতন অনেকটা।** কারণ চন্দরী দুহাত ভরে, রোজ সকালে অকাতরে ফুল বিলিয়ে যায়, ফ্রিতে ।তাই মোহরের ওপরে বসে থাকা , হাটেবাটে বিকিকিনি করা মেয়েও ক্রেডিট কার্ডে শান্তি খোঁজে।

The END